রাই শোন আজ

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক : শ্রীদ্বিজদাস কর, অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলকাতা-৯

নব কলেবরে : ৯ মে, ১৯৬৩

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীধীরেন শাসমল

মুদ্রক : শ্রীদ্বিজদাস কর, শ্রীধর প্রিণ্টার্স
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলকাতা-৯

লেখা বন্দ্যোপাধ্যায়কে—

আন্তরিকতার সঙ্গে

আমাদের প্রকাশিত
লেখকের অন্য বই :
আরক্ত রজনী

এক

সানাই বাজছে।

ইমন কল্যাণ রাগে মধুর তানে সুরের জাল বুনে চলেছে সানাই-বাদক। একনাগাড়ে অনেকক্ষণ ধরে শুনতে ইচ্ছে করবে এই মন-মুগ্ধকর সুব। ভাগলপুর থেকে বেশ মোটা টাকা বায়না দিয়েই সানাই বাদক ও তার সহশিল্পীদের আনিয়েছেন হরিদয়াল চতুর্বেদী।

সত্যি কথা বলতে কি এ-ব্যাপারে তাঁব খুব উৎসাহ ছিল না। উৎসাহ থাকবেই বা কিভাবে? প্রত্যেক জিনিষের একটা সীমা আছে। কিন্তু তাঁর স্ত্রী মনোরমা বেঁকে বসলেন। কোন ওজোর আপত্তি শুনলেন না। এক-রকম ঝঙ্কার দিয়েই বললেন, সেকি কথা! আমাব পাঁচটা নয় সাতটা নয়, একটা মাত্র মেয়ে, তাব বিয়েতে সানাই বাজবে না?

ইতস্তত করে হরিদয়াল বলেছেন, কিভাবে সব দিক বজায় রাখছি দেখতে তো পাচ্ছো। আম'র সাধ্যেব তো একটা সীমা আছে?

—এত যখন করলে, সানাই বাদ দিও না। এ-ইচ্ছে আমার অনেক দিনের।

হরিদয়াল আর কথা বাড়ান নি।

স্থান ত্যাগ করেছেন গম্ভীর মুখে। তিনি মেয়ের বিয়েতে যে সাধ্যাতীত করছেন তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। অবশ্য কতটুকুই বা সাধ্য তাঁর! অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে হাজার পাঁচেক টাকা কুড়িয়ে-বাড়িয়ে সংগ্রহ করেছেন কোনরকমে। এতে যে তাঁর শেষ সম্বল বাড়িটা বন্ধক রাখতে হয় নি এই যথেষ্ট। যদিও তিনি বাড়ির বিনিময়েই প্রথমে টাকা সংগ্রহ করাকে বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। শুধু হাত পেতে টাকা নেওয়ার চেয়ে এভাবে টাকা নেওয়াটা বরং কিঞ্চিত সম্মানজনক।

মনোরমা বলেছিলেন, তুমি কেন এত চিন্তিত হচ্ছো। আমি পাকুড়ে চিঠি দিচ্ছি। ওরা একটা ব্যবস্থা করে দেবেই।

আমাদের প্রকাশিত
লেখকের অন্য বই :

আরক্ত রজনী

অতি ভালোমানুষ হরিদয়াল সম্পর্কে সকলের এক ধারণা—টাকা তিনি মেরে দেবেন না। একটু বিলম্ব হলেও পাইপয়সা শোধ করে দেবেনই।

ওই পাঁচ হাজারের মধ্যে তিলক আর বিয়ে দু-ই সারতে হচ্ছে।

কেনা-কাটা সব হয়ে গেছে।

আজ কিছু খরচের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে রয়েছেন। অথচ এমন দিন গেছে, যখন দু-চার হাজার টাকাকে টাকা বলেই জ্ঞান করেন নি তিনি। সে সব কথা আজ মনে পড়লে হৃদয় মথিত করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে হরিদয়াল চতুর্বেদীর। তিনি কেমন অবসন্ন হয়ে পড়েন।

আসলে তাঁরা বিহারের লোক নন। উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদে চতুর্বেদীদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সুমহান ঐতিহ্য দীর্ঘ শতাব্দী ধরে ছেয়ে রয়েছে। এমনও শোনা গেছে, পাঞ্জাব কেশরী রঞ্জিত সিং-এর যখন চরম দুরবস্থা চলেছে তখন চতুর্বেদীরা কয়েক সিন্দুক আশরফি জোগান দিয়ে তাঁর মান বাঁচিয়েছিলেন।

এই জনশ্রুতি উৎপত্তি হওয়ার কয়েক পুরুষ পরের লোক হলেন হরিদয়ালের বাবা রামদয়াল। তিনি অত্যন্ত আত্মসচেতন ও দৃঢ়চেতা ছিলেন। সামান্য পারিবারিক বিবাদের সূত্রপাতেই তিনি গৃহত্যাগ করেন। শুধু গৃহত্যাগই নয়, মোরাদাবাদ ও উত্তরপ্রদেশ ছেড়ে বিহারের এই মুঙ্গেরে চলে আসেন।

স্ত্রী এবং দুই ছেলেকেও তিনি সঙ্গে এনেছিলেন। ছেলে দুজন তখন নাবালক। তাছাড়া তাঁর সঙ্গে ছিল কুড়ি হাজার টাকা—যা তিনি সম্পূর্ণ নিজের পরিশ্রমে অর্জন করেছিলেন।

ভারতবর্ষ বিরাট দেশ। রামদয়াল কাছাকাছি যে কোন জায়গায় যেতে পারতেন। তা না গিয়ে মোরাদাবাদ থেকে সুদূর মুঙ্গেরে চলে আসার কারণ সম্পূর্ণ সঙ্গত। বছর দুই আগে রামদয়াল মুঙ্গেরে বেড়াতে এসেছিলেন। এসেছিলেন বাল্যবন্ধু মূলচাঁদের আমন্ত্রণে। মূলচাঁদ বেশ কয়েক বছর হল জঙ্গল ইজারা নিয়ে কাঠের ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন এখানে।

মুঙ্গের খুঁটিয়ে দেখেছিলেন রামদয়াল। প্রাকৃতিক শোভা, বিরাট চওড়া গঙ্গাই যে শুধু তাঁকে মুগ্ধ করেছিল তাই নয়, এখানকার ইতিহাসও রাম-

দয়ালকে কম আকর্ষণ করে নি। ইতিহাস যবে থেকে লেখা হচ্ছে, মুঙ্গেরের উল্লেখ পাওয়া যাবে তবে থেকে। অবশ্য সর্বকালে একই নামে মুঙ্গের খ্যাত ছিল না। পাল্টেছে। অনেকবার নাম পাল্টে গেছে এই জনপদের।

মহাভারতেব যুগে এখানে মুনি-ঋষিদের একটা বড় রকম আড্ডা ছিল। তারপর মাঝের বেশ কিছুটা ইতিহাস ছায়াচ্ছন্ন। মোগল আমলে মুঙ্গেরের নাম অসম্ভব দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে চাবিদিকে। তাখ্ত-ইয়া-তাবুত—এই স্লোগান তুলে শাহজাহানের চার ছেলে যখন রক্তের নেশায় মেতে উঠেছেন, বিপন্ন সুজা মুঙ্গের দুর্গে তখন আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এরপর কত বছর কেটে গেল। মুঙ্গেবের সুবিখ্যাত দুর্গ ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের অধিকাবে কিভাবে গেল তা জানা যায় না। তবে প্রয়োজনের খাতিবে এই দুর্গ গোলাম হোসেনের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন বাংলার ইতিহাসের খাপখোলা তলোয়ার মীরকাশিম।

শুনতে শুনতে রামদয়াল বাংরবার নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন।

তাঁর মুখের ভাব লক্ষ্য করে মূলচাঁদ বলেছিলেন, মোরাদাবাদ ছেড়ে আমি কি সাধে এখানে চলে এসেছি! এরকম চৌকোশ জায়গা তুমি আর পাবে না। আমার কথা শোন, তুমিও এখানে এসে আড্ডা গাড়ো।

—আমি!

—হ্যাঁ।

—আমাব তেজারতি কারবারের কি হবে?

—তুমিই তো বলছিলে কাববার তেমন চলছে না। ভাই আর ভাইপো-দের সঙ্গেও তেমন বনিবনা হচ্ছে না। এক্ষেত্রে···

—দেখি—

এই ঘটনার দু'বছর পরে তিনি সপরিবারে মুঙ্গেরে এলেন।

তেজারতি কারবারে আর নামলেন না। টাকা উপায় করবার বড় ছেঁচড়া পথ। ও-পথ পবিহার করে অন্য কোন ব্যবসায় মন দেওয়াই ভাল। মূলচাঁদ পরামর্শ দিলেন কাঠের ব্যবসা করতে। শহরের কাছ দিয়ে একটা রেঞ্জ সরল রেখার মত চলে গেছে। পাহাড়ের তরাই অঞ্চলের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে শাল, সেগুন আর শিশুর সমারোহ।

মূলচাঁদের সহযোগিতায় এই জঙ্গলের কিছু অংশ ইজারা নিলেন রামদয়াল। মন-প্রাণ ঢেলে কাজের সঙ্গে মিশে গেলেন। বৃহস্পতি তখন তাঁর তুঙ্গী। সুতরাং কোন অসুবিধে হল না। ব্যবসা জমে উঠল। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ওপর রুপোলী আস্তরণ পড়তে লাগল।

প্রথম বছরই জমি কিনলেন। দ্বিতীয় বছর বিরাট বাড়ি ফাঁদলেন রামদয়াল। মুঙ্গেরের লোক এই প্রবাসী ব্রাহ্মণের উত্তরোত্তর উন্নতি লক্ষ্য করতে লাগল। রামদয়াল ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে এবং নিজে ব্যবসায়ী হয়েও টাকা ছাড়া মনের মধ্যে আরো অনেক কিছুকে স্থান দিতেন। শিক্ষার মূল্যকে তিনি কোনদিন অস্বীকার করেন নি। নিজের দুই ছেলে হরিদয়াল ও দীনদয়ালকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলবার কার্যসূচী গ্রহণ করেছিলেন। এই খাতে জলের মত অর্থব্যয় করতে তাঁর কোন কুণ্ঠা ছিল না।

কিন্তু মানুষের সব আশা ফলবতী হয় না।

বহু চেষ্টা ও অপর্যাপ্ত অর্থব্যয় করেও রামদয়ালের স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। হরিদয়ালকে কোনরকমে ম্যাট্রিকের দরজা পার করান গেল। কিন্তু বারকয়েক চেষ্টা করেও দীনদয়াল ওই দরজা অতিক্রম করতে পারলেন না।

রামদয়াল বুঝলেন আর পণ্ডশ্রম করা মিথ্যে। আশা ভঙ্গের বেদনা নিয়ে দুজনকে ঢুকিয়ে দিলেন ব্যবসায়। দিন গড়িয়ে চলল। ক্রমে দেখা গেল, দীনদয়াল হিসেবপত্রর কাজে এবং কুলি খাটানোর ব্যাপারে প্রভূত দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন কিন্তু হরিদয়ালের কাজে তেমন উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। তিনি নিজেদের শ' মিলে যাওয়ার চেয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা ও তাস-পাশা খেলে সময় কাটানোই বাঞ্ছনীয় মনে করছেন।

এ-ব্যাপারটা রামদয়ালের চোখ এড়িয়ে গেল না।

বিশেষ উদ্বিগ্ন হলেন তিনি।

ব্যবসাদারের ঘরের ছেলে, টাকা-পয়সা না চিনে তাস-পাশাকে চিনল, এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি থাকতে পারে? কল্পনার শেষপ্রান্তে পৌঁছেও তিনি আগে মনে স্থান দিতে পারতেন না তাঁর কোন ছেলে ব্যবসা-বিমুখ হবে। কিন্তু শুধু আক্ষেপ করলে চলবে না। একটা পথ বার করে হরিদয়ালের জীবনে মোড় ঘোরাতে হবে।

স্ত্রীর সঙ্গে এ-বিষয়ে পরামর্শ করা স্থির করলেন। জীবনের অনেক বেতাল মুহুর্তে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি সুফল পেয়েছেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হরিদয়ালের ভবিষ্যত নিয়ে অনেক কথা হল। শেষে স্থির হল, ছেলের বিয়ে দিয়ে দেওয়াই হল উপযুক্ত পথ। ঘরে বৌ এলে বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাইরে বাইরে থাকার অভ্যাসটা নিশ্চয় কেটে যাবে।

পাত্রীর অনুসন্ধান চলল।

একের পর এক সম্বন্ধ আসতে লাগল।

কিন্তু কোনটাই পছন্দ হল না রামদয়ালেব। আজ তাঁর টাকার অভাব নেই। পাত্রীপক্ষ নিজের বংশের আভিজাত্য দেখিয়ে এবং তাড়াতাড়ি নোটের খসখসানি শুনিয়ে যে একটি কুরূপা মেয়েকে তাঁর ঘরে বধূর আসনে বসিয়ে দেবে. তাতে তিনি রাজী নন। ছেলেকে বিক্রী করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তাঁব নেই। তি ন মেয়ের বাপ যদি গরীব হন ক্ষতি নেই। শুধু মেয়েটি হবে সুশ্রী, শান্ত, নম্র স্বভাবের।

শেষে এইরকম একটি মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেল।

সন্ধান দিলেন গোঁসাইজী।

গোঁসাইজী পাড়ার রাম-সীতা মন্দিরের পূজারী। মেয়ের বাপ গোঁসাইজীর দূর সম্পর্কের আত্মায় হন। নলহাটিতে থাকেন। অবস্থা তেমন ভাল নয়। কয়েক ঘর যজমান আছে—বারোয়ারী পূজাও করেন কয়েক জায়গায়, ওতেই সংসার চলে যায় কোনরকমে।

গোঁসাইজীর কাছ থেকে সমস্ত কথা মন দিয়ে শুনলেম রামদয়াল।

বললেন, আপনি যখন বলছে তখন মেয়েটি নিশ্চয় সুন্দরী হবে। তবে একবার নিজে চোখে দেখে নিলে ভাল হত।

ওঁদের সমাজে মেয়ে দেখার তেমন রেওয়াজ নেই। এখন আধুনিকতার ছাপ পড়ায় মেয়ে দেখার রেওয়াজ হয়েছে শহর অঞ্চলে। আগে এ-সমস্ত কথা চিন্তা করাই যেত না। জুয়াতে মোটা টাকা জেতা যেমন ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। ফ্লাসে অনেকক্ষণ ব্লাইণ্ড খেলার পর তাস উল্টে হয়তো দেখা গেল কিছুই নেই, কিম্বা টেক্কার ট্রায়ো। তেমনি প্রথম মিলন রাত্রিতে প্রত্যেক বরের হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হত। ঘুংঘট তুলে হয়তো দেখা যাবে সে

সুন্দরী—হয়তো দেখা যাবে সে কুরূপা। রামদয়াল উদারপন্থী, তাই প্রথমেই কথা পেড়ে রাখলেন।

গোঁসাইজী বিন্দুমাত্র আপত্তি না করে বললেন, বেশ তো! আপনি মেয়ে দেখতে যাবেন এতো সুখের কথা। আমি আজই চিঠি দিচ্ছি ওঁদের।

নলহাটিতে চিঠি গেল।

নির্দিষ্ট দিনে গোঁসাইজীকে সঙ্গে নিয়ে রামদয়াল নলহাটি গেলেন।

মেয়েটিকে খুবই পছন্দ হল তাঁর। যেন সাক্ষাত জগদ্ধাত্রী। তবে একটা অসুবিধে দেখা দিল, মেয়েপক্ষের কেউ একবর্ণ হিন্দী বলতে পারেন না। মেয়েটিও না। এঁরা বাঙালী নন। রামদয়ালের স্বজাতীয়। হিন্দী ভুলে বাংলাকে আঁকড়ে ধরার একটা সঙ্গত কারণ আছে।

আলীবর্দি খাঁর আমলে পাইক-বরকন্দাজের কাজে যোগ দেবার জন্যে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যভারত ও বিহার থেকে বহুলোক বাংলায় গিয়েছিল। তারা আর কেউ দেশে ফিরে যায় নি। স্ত্রী-পুত্রদের আনিয়ে বাংলায় স্থায়িভাবে ঘর বেঁধেছিল। কিছুদিন বসবাস করবার পর একটা জিনিষ প্রকট হয়ে উঠল। আগন্তুকরা মাতৃভাষা ভুলে গিয়ে বাংলার সংস্কৃতি ও ভাষাকে আপন করে নিচ্ছে। যদিও বিবাহ আদি অন্যান্য প্রদেশের স্বজাতীয়দের সঙ্গেই হতে থাকল। পাত্রীর পূর্বপুরুষ এইভাবেই কানপুর থেকে একদিন বাংলার মাটিতে এসে পা দিয়েছিলেন।

এই অসুবিধেকে গ্রাহ্য করলেন না রামদয়াল। মেয়ের বাবাকে পাকা-কথা দিয়ে তিনি ফিরে এলেন মুঙ্গেরে। স্ত্রীকে বললেন সব কথা।

সব শুনে হরিদয়ালের মা বললেন, পাকা-কথা তো দিয়ে এলে। এদিকে আবার বলছো মেয়েটি একবর্ণ হিন্দী বলতে পারে না। বৌ নিয়ে ঘর করতে কিরকম অসুবিধে হবে বলতো?

—সাময়িক অসুবিধের কথা ভেবে আমি সবদিক দিয়ে ভাল ওই মেয়েটিকে হাত-ছাড়া করা সুবিবেচনার কাজ বলে মনে করলাম না। তাছাড়া অসুবিধেই বা কি? ওইতো আমাদের কৈলাশের বৌ, বাংলাদেশের মেয়ে। কেমন সুন্দরভাবে সংসারে মানিয়ে নিয়েছে বলতো? আমাদের বৌমাকে নিয়েও কোন অসুবিধেয় পড়তে হবে না, দেখে নিও।

কৈলাশ রামদয়ালের ভাগ্নে।

যথাসময় বিয়ের পর্ব চুকে গেল।

মনোরমা এলেন শ্বশুরঘরে। এবং এসেই সুন্দরভাবে মানিয়ে নিলেন শ্বশুরবাড়ির সকলের সঙ্গে। হিন্দী শেখবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। আড়ালে রামদয়াল স্ত্রীকে বললেন, দেখলে, আমি বলি নি তোমায়? অভিজ্ঞ চোখ কখনও প্রতারিত হয় না হরির মা।

এরপর কেটে গেল কয়েক বছর।

মনোরমার কোলে এল ওমপ্রকাশ।

বৃদ্ধ রামদয়াল স্বর্গসুখে দিন কাটাতে লাগলেন। পৌত্রের কলহাস্যে তাঁর বিরাট বাড়ি মুখর হয়ে উঠুক, এ তাঁর কতদিনের আকাঙ্ক্ষা!

হাসতে হাসতে পুত্রবধূকে বলেছেন, শালা আমাকে কাজকর্ম সব ভুলিয়ে দিচ্ছে। ইচ্ছে করে গদিতে না গিয়ে বাড়িতেই ওকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি।

ঘোমটা একটু টেনে মনোরমা বলেছেন নাইবা গেলেন গদিতে! বয়স হচ্ছে, এখন তো বিশ্রাম চাই। ওমও আপনার কাছে থাকতে ভালবাসে।

—পাগলী মেয়ে, আমি গদিতে না গেলে কি চলে? ছেলেরা এতবড় ব্যবসা সামলাতে পারবে কেন' তাদের অভিজ্ঞতা কতটুকু? বছর দশেক আরো বে-ওজোরে আমি গদিতে যেতে পারবো।

এই কথা শুনে বিধাতা বোধহয় হেসেছিলেন।

মাসখানেক পরে রামদয়াল পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলেন। রোগে অবশ্য তাঁকে বেশি ভুগতে হল না। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সাধের ব্যবসা ও প্রিয় পৌত্রকে রেখে তিনি পৃথিবীর মায়া কাটালেন। তাঁর স্ত্রী গত হয়েছেন আগেই, সুতরাং হরিদয়াল ও দীনদয়ালের মাথার ওপর আর কেউ রইল না।

প্রথমে দুজনেই একটু অসহায় বোধ করলেন। বটের ছায়ায় ছিলেন। এখন যেন প্রখর রোদ্দুরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। তবে দিন কারুর জন্যে আটকে থাকে না। দুই ভাই অসীম বলে নিজেদের সামলালেন। রামদয়ালের

অনুপস্থিতিতেও চতুর্বেদী পরিবারের সমস্ত কিছু ঠিক আগেকার মতই চলতে লাগল।

দীনদয়াল ব্যবসাকে আরো উন্নত করে তুললেন। ছোটভাই এর বিয়ে দিলেন হরিদয়াল। সংসারে আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল। সময় কেটে চলল। লক্ষ্য করা গেছে, প্রায় ক্ষেত্রেই দুঃখের দিন দীর্ঘস্থায়ী হয়। কিন্তু সুখের দিনকে কেন কে জানে বেশিদিন স্থায়ী করা যায় না।

চতুর্বেদী-পরিবারের আনন্দে একদিন ভাটা দেখা দিল।

হরিদয়াল লক্ষ্য করলেন দীনদয়াল আজকাল কেমন গম্ভীর থাকেন। তাঁকে এড়িয়ে চলতে পারলেই যেন খুশি হন। এর অর্থ তখন বুঝতে না পারলেও কয়েকদিন পরে বুঝতে পারলেন হরিদয়াল।

একদিন সন্ধ্যায় একথা-সেকথার পর দীনদয়াল বললেন, শুনেছো, সচদেব বাড়ি বিক্রী করবে বলছে।

সচদেব কোর্টে কাজ করে। থাকে পাড়ায়।

—কই না!

—বলছিল কাল। আমি স্থির করেছি, বাড়িটা কিনে নেবো।

হরিদয়াল আকাশ থেকে পড়লেন

- কিনে নিবি?

প্রায় দশ সেকেণ্ড বড়ভাই-এর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে পরিষ্কার গলায় দীনদয়াল বললেন, হ্যাঁ দাদা। আমি আলাদা থাকতে চাই।

—আলাদা থাকতে চাস! কেন?

—এখন আমাদের আলাদা থাকাই তো উচিত।

—কেন উচিত আমি তো বুঝতে পারছি না?

—তোমাকে বুঝিয়ে বলতেও পারবো না দাদা। মোট কথা হল, আগামী সপ্তাহে আমি সচদেবের বাড়িতে উঠে যাচ্ছি।

কথাটা শেষ করেই দীনদয়াল স্থানত্যাগ করলেন।

বাড়ি বদল করবার পর দীনদয়ালের স্বরূপ দিনের আলোর মতই পরিষ্কার হতে লাগল। টুকরো টুকরো কথার ইঙ্গিতে নিজের মনের ভাব বুঝিয়ে দিতে লাগলেন বড়ভাইকে। দীনদয়াল তাঁর সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে চান না, হরিদয়াল

সেটা বুঝলেন।

তারপর একদিন সেই চরম দিন এল। হরিদয়াল জানতে পারলেন, আইনের কোন মারপ্যাঁচে দীনদয়াল পৈতৃক ব্যবসা নিজের নামে করে নিয়েছেন। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি। দিলদরিয়া, বৈঠকী লোক তিনি। ব্যবসা তেমন বোঝেন না। ছোটভাই-এর হাতে সমস্ত কাজকর্ম সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। বরং মনোরমা বলেছিলেন, কাজকর্ম একটু ভাল করে দেখ। ছোটভাই-এর ওপর এতখানি নির্ভর করা ঠিক নয়।

মনোরমার সেকথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন হরিদয়াল।

বলেছিলেন, মেয়েদের বুদ্ধি নিয়ে স সার চালাতে গেলেই হয়েছে! দীনু আমার ভাই, তাকে আমি তোমার চেয়ে বেশি চিনি বড়বৌ।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু মনোরমার কথাই ঠিক হল। অর্থের লালসায় মানুষ পশু হয়ে যায় তিনি জানতেন। তবে দীনদয়াল পশু হয়ে যাবেন, তিনি তা ভাবতে পারেন নি। হরিদয়ালের পরিচিত সকলেই তাঁকে আইনের সাহায্য গ্রহণ করতে পরামর্শ দিলেন। এতবড় অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবার কোন অর্থ হয় না।

হরিদয়াল ক্লিষ্ট হেসে বললেন, দিনু যা করেছে তাতেই আমাদের পরিবারের সম্মান যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছে, আবার কোর্টে গিয়ে নিজেদের আর বেশি হাস্যাস্পদ করতে চাই না।

সমস্ত শুনে মনোরমা বললেন, তুমি কি চাও আমরা ছেলেটার হাত ধরে পথে গিয়ে দাঁড়াই?

—পথে গিয়ে কেন আমরা দাঁড়াবো বড়বৌ। এই বাড়িটা তো দীনু বেনামা করে নি। তবে সচ্ছলতা অনেক কমে যাবে স্বীকার করি।

—কেন তুমি আদালতের সাহায্য নেবে না?

—বড়বৌ—

—কেন তুমি এই অনাচার মুখ বুজে সয়ে যাবে বলতে পারো?

—দীনু অন্যায় করেছে। আমরা বড়, আমরা তার অন্যায়কে ক্ষমা করবো বড়বৌ। ভগবান মানুষকে তো এইভাবেই পরীক্ষা করেন। সচ্ছলতার মধ্যে তো এতদিন বাস করলাম, এবার অভাব-অভিযোগের

মধ্যে কিছুদিন কাটালে ক্ষতি কি ?

এই খামখেয়ালী লোকটিকে আর কি বলবেন মনোরমা।

রাগে, দুঃখে, অভিমানে চুপ করে গেছেন।

এই ঘটনার বছর দুয়েক পরে কাজলের জন্ম হয়েছে।

কাজল নামটি অবশ্য অবাঙালী মহলে তেমন প্রচলিত নয়। মনোরমা রেখেছেন নামটি। ছোটবেলায় কাজল দিঘির পাড়ে পাড়ে খেলা করে বেড়িয়েছেন তিনি,—তাই বোধহয় সেই স্মৃতিকে অমর করে রাখবার জন্তেই মেয়ের নাম রেখেছেন কাজল।

বড় হতে লাগল কাজল।

ওদিকে ছেলেকে হাতের নাগালের মধ্যে পান না মনোরমা।

উদ্ধত স্বভাবের ওমপ্রকাশ সব সময় বাড়ির বাইরে বাইরে থাকে। পড়াশোনায় মন নেই। টো-টো করে যে কোথায় ঘুরে বেড়ায় কে জানে। হরিদয়াল অনেক চেষ্টা করেও তাকে বশে আনতে পারেন নি। যে শাসনে থাকবে না স্থির করে ফেলেছে, তাকে হাতের মুঠোয় পাওয়া শক্ত। সম্প্রতি সংবাদ পেয়েছেন, ওমপ্রকাশ নাকি দীনদয়ালের বাড়ি যাওয়া-আসা করে। তবে কি দীনুই তাকে···

ছেলেকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন ছিল মনোরমার। কোন্ মায়ের না থাকে ? ওমপ্রকাশ নিজের স্বভাবের দোষে সে-স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। ছেলের সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে মনোরমা মেয়েকে মনের মতো করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কাজলকে তিনি বাংলা শেখাবেন,— বাংলার কৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত করবেন।

মনোরমাকে আবার নিরাশ হতে হল। প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল কাজল নিজেই। জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পদে পদে সে মাকে বুঝিয়ে দিতে লাগল, এতদিন তাদের বাড়িতে বাস করবার পরও বাংলার টান রেখে হিন্দীতে কথা বলা অন্যায়, ওই ধরনের শাড়ি পরার চলন তাদের সমাজে অচল ইত্যাদি।

মেয়ের কথায় স্তম্ভিত হয়ে যান মনোরমা !

কখনও কখনও অনন্যোপায় হয়ে বলেছেন, কি করবো মা, যে পরিবেশে

জন্মেছি, বড় হয়েছি, সে সমাজের সমস্ত সংস্কারকে কিভাবে ঝেড়ে ফেলে দেবো?

—ইচ্ছে থাকলে সব হয়। তোমার ব্যাপার-স্যাপারে আমাকে রীতিমত লজ্জায় পড়ে যেতে হয়।

—আমার জন্যে তোমাকে লজ্জায় পড়তে হয়?

—সময় সময় পড়তে হয় বৈকি।

আর কথা বাড়ান নি মনোরমা। কোন লাভ তো নেই। ওইটুকু মেয়ের কথা শুনে ক্ষোভে, দুঃখে তাঁর চোখ ফেটে প্রায় জল বেরিয়ে এসেছে। দ্রুতপায়ে সে-স্থান ত্যাগ করেছেন তিনি। হরিদয়ালকে কোন কথা বলেন নি। শুধু দুঃখ করেছেন স্নেহপ্রভার কাছে।

পারিবারিক গণ্ডি পেরিয়ে একমাত্র স্নেহপ্রভার সঙ্গেই তিনি পরিচিতা। দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব আজ বহু বছর ধরে।

হরিদয়াল মুঙ্গেরের যে অভিজাত পাড়ায় বাস করেন, শঙ্করনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহ সেখানেই। ধনীর সন্তান। কৃতি ইঞ্জিনিয়ার। কর্ম-জীবনে অনেক বড় বড় শহরে তাঁকে থাকতে হয়েছে। বছর কয়েক হল অবসর নিয়ে ফিরে এসেছেন পৈতৃক বাড়িতে। মিষ্টভাষী হিসেবে তাঁর সুনাম আছে। স্ত্রী স্নেহপ্রভা, দুই ছেলে, এক মেয়ে ও জামাইকে নিয়ে তাঁর সংসার।

মনোরমা আর স্নেহপ্রভার বিয়ে হয়েছিল মাস কতকের আড়াআড়িতে। পাশাপাশি বাড়িতে বাস। আলাপ হতে বিলম্ব হয় নি। তারপর সেই আলাপ দ্রুতলয়ে অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়েছে। সময় পেলেই দুজনে নিজেদের মনের কথা দুজনের কাছে উজাড় করেছেন।

মনোরমার কথা শুনে স্নেহপ্রভা বললেন, তুই কার কাছে দুঃখ করছিস ভাই? আমার বাড়িতেও ওই এক অবস্থা।

—তার মানে?

—কৃষ্ণারও ওই এক কথা।

—কি বলেছে কৃষ্ণা?

—আমি যে তোর সঙ্গে মেলামেশা করি এতে তার রাগ। তার বক্তব্য হল, কি দরকার অবাঙালীদের সঙ্গে এত দহরম-মহরম করবার? আজকালকার

মেয়েদের যে কি মতিগতি কিছুই বুঝি না!

—কিরকম দিনকাল পড়ল ভাই!

—সত্যি—

কৃষ্ণা স্নেহপ্রভার মেয়ে।

কাজলের সহপাঠিনী ছিল সে। কিন্তু দুজনের মধ্যে কোন বন্ধুত্ব ছিল না।

সেই কাজলের বিয়ে।

চারিদিকে ব্যস্ততা। সেই ব্যস্ততাকে পাশ কাটিয়ে, সানাই-এর আলাপ শুনতে শুনতে ভেতর থেকে বাইরের বাড়িতে এলেন হরিদয়াল। মন্দ বাজাচ্ছে না। টাকা একটু বেশি খরচ হল বটে—তা হোক। মনোরমার ইচ্ছেটা পূর্ণ করে উঠতে পেরেছেন এতদিনে। স্ত্রীর এই অনুরোধটুকু যে কোনরকমে রাখতে পেরেছেন, এখন ভাবতে ভাল লাগছে।

পাত্র ভালই পেয়েছেন হরিদয়াল।

ছেলেটি গ্র্যাজুয়েট।

দেখতে শুনতে ভাল! পাটনায় লোহার ব্যবসা আছে।

পাত্রটি দীনদয়ালের শালার ছেলে। দীনদয়ালই বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করেছেন। নইলে তাঁর মত লোকের পক্ষে এত উঁচুতে হাত বাড়ানো কোনমতেই সম্ভব হত না। কিছুদিন হরিদয়াল ও দীনদয়ালের মধ্যেকার সম্পর্ক উন্নত হয়েছে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে দাদার কাছ থেকে ক্ষমা চাইতে একদিন এসেছিলেন দীনদয়াল।

বছর চারেক আগেকার ঘটনা।

স্কুল থেকে বেশ কিছুক্ষণ হল হরিদয়াল ফিরেছেন।

গত পনেরো বছর ধরে তিনি স্থানীয় টাউন স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। তখন শিক্ষকতা করতে গেলে বি.টি. পাশের প্রয়োজনীয়তা ছিল না। স্কুল-কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে ম্যাট্রিক পাশ শিক্ষক নিযুক্ত করতে পারতেন হিন্দী পড়াবার জন্যে।

স্কুল ছাড়া কয়েকজন ছাত্রের গৃহশিক্ষক হরিদয়াল। সকালে গিয়ে তাদের

পড়িয়ে আসেন। মিলিয়ে-জুলিয়ে যা আয় হয়, তাতে সংসারের প্রয়োজন মোটামুটি মিটে যায় বলা বলে।

মোড়ায় বসে তামাক খাচ্ছিলেন তিনি।

সন্ধ্যা তখন হয় হয়। দীনদয়াল এলেন।

ঠাওর করতে না পেরে হরিদয়াল প্রশ্ন করলেন, কে?

সসঙ্কোচে দীনদয়াল বললেন, দাদা, আমি—

—কে দীনু? আয়—আয়, বোস।

দীনদয়াল অরেকটা মোড়া টেনে নিয়ে বসলেন। বহু বছর পরে দুই ভাই-এর মুখোমুখি দেখা। কিন্তু হরিদয়াল এমনভাবে কথা বললেন, যেন মনে হল প্রত্যহই তাঁদের দেখা হয়। কিছুই হয় নি দুজনের মধ্যে।

একটু ইতস্তত করে দীনদয়াল বললেন, তোমার শরীর খুবই খারাপ হয়ে গেছে।

—বয়স তো কম হল না।

—কি আর এমন তোমার বয়স হয়েছে?

হরিদয়াল হাসলেন।

—তুই ভাল আছিস? বৌমার শরীর কেমন? কার মুখে শুনেছিলাম যেন খুব কলিকে ভুগছেন।

—এখন ভাল আছে। দাদা....আমি....

—কিছু বলবি?

—বলছিলাম...

—থামলি কেন? বল না?

দীনদয়াল মরিয়া হয়ে বলে উঠলেন, আমি ঘোর অন্যায় করেছি। তুমি কি আমায় ক্ষমা করতে পার না, দাদা?

হরিদয়াল চোখ তুলে ভাল করে তাকালেন দীনদয়ালের দিকে।

সেই উদ্ধত যুবক দীনদয়াল আর নেই। মোটা হয়ে গেছে। টকটকে রঙ রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। রগের দুপাশের চুলে পাক ধরেছে। মুখের ওপর বয়সের রেখা পড়েছে বেশ কয়েকটা।

—কিসের কথা তুই বলছিস দিনু?

—তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছো। ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য আমি নই জানি, তবু—

—আমি তো তোর ওপর রাগ করি নি দীনু।

—আমি তোমাকে ঠকিয়েছিলাম দাদা। কেন যে সেদিন পশুর মত কাজ করেছিলাম, আজ তা ভেবে পাই না। বিশ্বাস কর, বছরের পর বছর আমাকে এই চিন্তাই কুরে-কুরে খেয়েছে।

দীনদয়াল থামলেন। দম নিলেন বোধহয়।

বললেন আবার, চেষ্টা করেও আমি এতদিন তোমার কাছে আসতে পারি নি। সাহস হয় নি। আজ এসেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর দাদা।

হরিদয়াল একপাশে হুঁকোটা রেখে মোড়া ছেড়ে উঠে পড়লেন।

দীনদয়ালের কাছে গিয়ে বললেন, ক্ষমা করার কথা কেন তুই বার বার বলছিস? অন্তর থেকে বলছি, ক্ষমা তোকে আমি সেই দিনই করেছি। আজ বড় আনন্দের দিন দীনু। তুই নিজের ভুল বুঝতে পেরে আমার কাছে এসেছিস। আমি জানতাম নিজের ভুল তুই একদিন নিশ্চয়ই বুঝতে পারবি। বড়বৌ শুনছো—বলি শুনছো—

আহ্বান শুনে মনোরমা এলেন।

—দেখো—দেখো কে এসেছে!

মনোরমা আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠলেন।

—ঠাকুরপো, তুমি—

দীনদয়াল মাথা তুলতে পারছিলেন না।

কোনরকমে বললেন, আর থাকতে পারলাম না বৌদি। চলে এলাম।

—বেশ করেছো ভাই। রক্তের টান যাবে কোথায়? কি চেহারার ছিরি হয়েছে! ছোট তোমার দিকে একেবারেই দৃষ্টি দেয় না বোধহয়? একদিন গিয়ে আচ্ছা করে বকে আসতে হবে।

হরিদয়াল বললেন, আমরা এখানেই বসছি। তুমি দু-পেয়ালা চা করে নিয়ে এস তাড়াতাড়ি।

মনোরমা চা করে নিয়ে আসতে গেলেন।

দুই ভাই-এর মধ্যে গল্প চলতে লাগল। স্থানীয় পৌর নির্বাচনে কার চেয়ারম্যান হবার সম্ভাবনা থেকে আরম্ভ করে কাঁচা বাজার কিরকম চড়ে গেছে ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা এগিয়ে চলল। চা আর পাঁপড় ভাজা শেষ হল এক ফাঁকে।

একসময় দেওয়াল ঘড়িতে দশটা বাজল সশব্দে।

দুজনে চমকে ঘড়ির দিকে তাকালেন।

—বেশ রাত হয়ে গেছে তো! দীনদয়াল বললেন, এবার আমি উঠব দাদা!

—উঠবি ?

—হ্যাঁ দাদা।

—বেশ! কাল আবার আসিস।

—আসব বৈকি! একটা কথা কিন্তু এখনও বলা হয় নি।

—কোন্ কথা বলতো ?

—আমাকে আবার যখন আপন করে নিলে, তখন—

হরিদয়াল দ্রুতগলায় বললেন, আমি জানি তুই কি বলতে চাইছিস ? কিন্তু আজ আর তা হয় না। সম্পত্তি আমি ফিরিয়ে নিতে পারব না। ও নিয়ে আমাকে আর অনুরোধ করিস না।

—আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করবার একটা সুযোগ দাও!

—আমাকে পীড়াপীড়ি করিস না।

—দাদা—

—না—না, দীনু।

দীনদয়াল হাত চেপে ধরলেন হরিদয়ালের।

—এই পাপেই আমার সন্তান হয় নি। তুমি তোমার অংশ ফিরিয়ে নিয়ে আমাকে হাল্কা করে দাও, দাদা।

—জীবনটাকে আমি অন্য সুতোয় বেঁধে ফেলেছি। একসঙ্গে অনেক টাকা পেলে দিশেহারা হয়ে পড়ব। যেভাবে আছি, জীবনের বাকি ক-টা দিন এইভাবেই কাটিয়ে যাব স্থির করে রেখেছি।

বারংবার অনুরোধ করেও হরিদয়ালকে সম্পত্তির অর্ধাংশ নেওয়ার ব্যাপারে

রাজি করাতে পারলেন না দীনদয়াল। তিনি গোবেচারা ধরনের লোক হলেও, একবার কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তাঁকে টলান শক্ত।

অবশ্য এরপর থেকেই তাঁদের মধ্যেকার সম্পর্ক যথেষ্ট উন্নত হল। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দুই ভাই-এর মধ্যে দেখা-সাক্ষাত হতে লাগল। মনোরমাও যান দেওবের বাড়ি। কৌশল্যাও আসেন। দীনদয়াল ওমপ্রকাশকে স্থানীয় সিগারেট ফ্যাক্টরীতে একটা ভাল চাকরি সংগ্রহ করে দিলেন।

সময় কেটে যেতে লাগল।

দেখতে দেখতে অতিক্রম করল দু বছর।

সেদিন বেলা দুটোর সময় প্রায় ছুটতে ছুটতে হরিদয়াল বাড়ি ফিরলেন। তাঁর হাতে একখানা দৈনিকপত্র। তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন যে, এই সপ্তাহে কাজলের পরীক্ষার ফল বেরুবার কথা আছে। ক্লাস নিয়ে সবে বেরুচ্ছেন। অঙ্কের শিক্ষক পাণ্ডেজীর সঙ্গে সাক্ষাত হল।

তিনি সহাস্যে বললেন, মেয়ে পাশ করে গেছে, খবর পেয়েছেন তো?

—পাশ করে গেছে!

আনন্দে হরিদয়ালের সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। হাত থেকে পড়ে গেল খড়ি আর ডাস্টার।

—এখনও সংবাদ পান নি তাহলে! ডিস্‌টিংশন পেয়েছে। আমি আপনাকে প্রথম সংবাদ দিলাম, মিষ্টিমুখ থেকে যেন বঞ্চিত করবেন না চতুর্বেদীজী।

তিনি হাসতে হাসতে এগিয়ে গেলেন। হরিদয়াল ছুটলেন টিচার্স-রুমের দিকে।

'ইণ্ডিয়ান নেশন'-এর ওপর কয়েকজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন। আত্মীয় ও পরিচিতদের মধ্যে কে কে পাশ করেছে দেখে নিচ্ছেন। মেয়ের অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্যে হরিদয়ালকে সকলে অভিনন্দন জানালেন। তিনি সংবাদপত্রে কাজলের নাম দেখে নিয়ে, হেডমাষ্টারের কাছ থেকে ছুটি মঞ্জুর করিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

মনোরমাকে ডাকতে ডাকতে ভেতর-বাড়িতে গেলেন তিনি।

মনোরমা তখন ময়লা কাপড় সিদ্ধ করছিলেন। হাতের কাজ ফেলে এগিয়ে এলেন।

—কি, হল কি ? এত চেঁচামেচি করছো কেন ?

হরিদয়াল মুখে হাসি টেনে বললেন, আমি আজ স্কুল থেকে অসময়ে কেন চলে এলাম বলতো বড়বৌ ?

—কেন আবার! কোন কারণে ছুটি হয়ে গেছে বোধহয়!

—উঁহু। অন্য কারণ আছে। গুরুতর কারণ।

মনোরমা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—কি হয়েছে বল না ?

—তোমার মেয়ে খুব ভালভাবে পাশ করেছে গো।

—ওমা, তাই বুঝি!

হরিদয়াল আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, দীনদয়াল এলেন একটা ঝোড়া হাতে করে। তাঁর মুখ হাসি হাসি। শুভ-সংবাদটা পেয়েছেন বুঝতে পারা গেল।

মনোরমা বললেন, শুনেছো ঠাকুরপো, কাজল—

—শুনেছি বৈকি! তোমাদের মিষ্টিমুখ করাতে এলাম। কোথায় গেল সে ? ডাক না একবার।

—কাজল বাড়ি নেই। ঊর্মিলার ওখানে গেছে। ভাই ঠাকুরপো, কে ভাবতে পেরেছিল আমাদের বাড়ির মেয়ে বি.এ. পাশ করবে ?

—কেন করবে না শুনি ? কি রকম রক্ত তার শরীরে বইছে একবার ভেবে দেখ।

—বটেই তো! বিদ্যের ধড়াচূড়ো পরা সব বাপ-কাকা—

মুখ উঁচু করে ঘর ফাটিয়ে হাসলেন হরিদয়াল।

—দীনু, এই ফাঁকে তোর বৌদি আমাদের একচোট শুনিয়ে নিল।

কিছুক্ষণ তিনজনে হাল্কাভাবে কথা বলবার পর হরিদয়াল আর দীনদয়াল বাইরের ঘরে এসে বসলেন। সারাটা দুপুর কাটিয়ে দিলেন গল্প করে। আজ তাঁদের চরম আনন্দের দিন। চতুর্বেদীদের বিরাট ডালপালা ছাওয়া আত্মীয়-

গোষ্ঠীর মধ্যে আজ পর্যন্ত কোন মেয়ে ইন্টারমিডিয়েটের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে নি, গ্র্যাজুয়েট হওয়া তো অনেক পরের কথা।

একসময় দীনদয়াল প্রশ্ন করলেন, ওকে এম.এ. পড়াবে নাকি দাদা ?

—কাজলের তো পড়বার খুব ইচ্ছে। তবে····

—ওর যখন ইচ্ছে, তখন পড়ান উচিত।

—উচিত তো বটেই। কি হয়েছে জানিস—

—কি হয়েছে বলতো ? খরচ পত্তরের কথা ভাবছো ?

—না, না··· তাড়াতাড়ি হরিদয়াল বললেন, টাকা-পয়সার কথা আমি ভাবছি না। হোষ্টেলে রেখে আরো দু-বছর পড়াতে গেলে টাকা তো খরচ হবেই। সেজন্যে ভাবছি না। তাহলে এম.এ. ও পড়ুক, কি বলিস ?

তাঁর ভয় হল, এই সুযোগে দীনদয়াল তাঁকে টাকা সাহায্য করবার প্রস্তাব তুলতে পারে। তিনি তাই পথ আগেই মেরে রাখলেন। কাজলকে চার বছর পাটনার হোষ্টেলে রেখে পড়াচ্ছেন। বলতে গেলে শ্রেফ এই কারণেই ক-টি ছাত্রের গৃহশিক্ষক হয়েছেন। নইলে কুলিয়ে উঠতে পারবেন কেন ?

আবার দু-বছর !

তা হোক। ভেবেছিলেন গৃহশিক্ষকতা করা ছেড়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম নেবেন। না হয় দু-বছর পরেই ছাড়বেন। পড়ুক মেয়েটা। ওমপ্রকাশের তো লেখাপড়া হল না। কাজল না হয় দুজনেরটা পুষিয়ে নিক।

দীনদয়াল বললেন, পড়তে থাকুক, তবে ওই সঙ্গে পাত্রের সন্ধানও দেখতে হবে। খোঁজাখুঁজি করতে না থাকলে আতান্তরে পড়ে যেতে হবে। চোখের ওপর মহেশ নারায়ণকে তো দেখছো ! আগে খোঁজ-খবর করে নি, এখন কুড়ি হাজার টাকা তিলক দেবে বলে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে, অথচ ভাল একটা পাত্র পাচ্ছে না।

—মেয়েকে ভাল ঘরে দিতে গেলে পূর্বজন্মের সুকৃতি থাকা চাই।

—তাতো বটেই। তবে চেষ্টা তো করতে হবে ?

—তা আবার করতে হবে না ! একশো বার। ভাল পাত্র সন্ধানে থাকে তো দেখ না ! কিন্তু এই অজুহাতে তুই যে আমাকে কিছু টাকা গছাবি, তা হবে না।

ক্ষুণ্ণকণ্ঠে দীনদয়াল বললেন, তুমি এখনও আমাকে এতদূরে ঠেলে কেন রাখছো দাদা? বেশ, আমি এক নয়াপয়সাও খরচ করব না কাজলের বিয়েতে।

ভাই-এর দিকে সস্নেহে তাকালেন হরিদয়াল।

বললেন, দূরে ঠেলে রাখি নি। আসলে···যাক, মনে হচ্ছে তোর সন্ধানে কোন পাত্র রয়েছে?

—ওঙ্কারই তো রয়েছে।

—ওঙ্কার কে?

—আমার বড় শালা স্বরূপলালজীর ছেলে। তুমি তো তাকে দেখেছো। চমৎকার ছেলে! সুন্দর মানাবে কাজলের সঙ্গে!

হরিদয়াল ছেলেটিকে দেখেছেন। কয়েকবারই দেখেছেন। এমন কি, তার সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথাবার্তাও হয়েছে।

মনোরমারও পছন্দ ওঙ্কারকে। তিনি কথা-প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন, ছোটর ভাইপোটি বেশ!

হরিদয়াল সমর্থন জানিয়েছিলেন তাঁকে।

—বেশ বৈকি!

—কাজলের জন্যে যদি ওরকম একটি ছেলে পাই···

—চাঁদের দিকে হাত বাড়িও না বড়বৌ। দীনদয়ালের শালা বড়লোক। শুনেছি লোহার ব্যবসা করে কয়েক লাখ টাকা করেছে। সে আমাদের মত সাধারণ ঘর থেকে মেয়ে নেবে কেন, বল?

—ও-কথা তুমি বলছো কেন? কাজল রূপে-গুণে কম কিসে?

হরিদয়ালের মুখে ম্লানহাসি খেলে গেল।

—এত দেখেও তুমি দুনিয়াটাকে চিনতে পারলে না? বিয়ের ব্যাপারে এখন রূপ-গুণের বিচার হয় পরে। আগে ওঠে দাহেজের কথা। কম করেও হাজার বিশেক টাকা যদি হেঁকে বসে, আমি কি তা দিতে পারব?

—তুমি আগে থেকেই স্থির করে ফেলছো কেন? ওঁরা দাহেজ নাও চাইতে পারেন। লাখ লাখ টাকা আছে বলছো, সামান্য দাহেজ নিয়ে কি করবেন?

—আমাদের সমাজের ধনীদের কি তুমি চেনো না? যার যত বেশি টাকা আছে, ছেলের বিয়ে দেবার সময় সে তত বেশি হেঁকে বসে। কন্যাদায়গ্রস্ত মধ্যবিত্ত সমাজ দাহেজের চাপে পড়েই ক্রমে ক্রমে দারিদ্র্যকে বরণ করে নিচ্ছে।

মনোরমা তবু বললেন, আমি ছোটকে একবার বলে দেখি না! হয়তো সে তার দাদাকে বলে-কয়ে একটা ব্যবস্থা করতে পারে।

—না, না, ও সমস্ত করতে যেও না। কাজের কাজ কিছুই হবে না। মাঝ থেকে ছোট বৌমা অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়বেন।

দীনদয়ালের মুখ থেকে ওঙ্কারের কথা শুনে খুশি হলেন হরিদয়াল।

বললেন, ওঙ্কার খুবই ভাল ছেলে, তাকে আমার বিলক্ষণ পছন্দ। তবে···

—আবার তবে কিসের দাদা?

—স্বরূপলালজী ধনীব্যক্তি। তিনি কি কাজলকে পুত্রবধূ করতে চাইবেন?

—তুমি বোধহয় দাহেজের কথা বলছো?

—তুই ঠিকই ধরেছিস। বড় একটা অঙ্ক হেঁকে বসলে আমি তো ভাই দিতে পারব না।

দীনদয়াল বললেন, কথা পেড়ে দেখতে দোষ কি? অনেক টাকা যদি চেয়ে বসেন, আমরা ওখানে মেয়ের বিয়ে দেব না।

যুক্তি অকাট্য। হরিদয়াল মত দিলেন।

দীনদয়ালের এই বিবাহ-প্রস্তাবের নেপথ্যে একটা ইতিহাস আছে।

কৌশল্যা, অর্থাৎ দীনদয়ালের স্ত্রীকে একদিন ওঙ্কার ধরে বসল, সে কাজলকে বিয়ে করবে, সমস্ত ব্যবস্থা যেন তিনি করে দেন।

ভাইপোর কথা শুনে কৌশল্যা অবাক। পরমুহূর্তে কেমন উৎসাহ বোধ করতে লাগলেন। কথাটা পাড়লেন দীনদয়ালের কাছে।

দীনদয়াল মন দিয়ে সমস্ত শুনে বললেন, সবই বুঝলাম! দাদার মতও আমি করিয়ে নেব। কিন্তু তোমার দাদাকে কি রাজি করানো যাবে?

—চেষ্টা করলে কেন রাজি করানো যাবে না? উনি টাকা-পয়সা সম্বন্ধে একটু বেশি সচেতন, তা আমি জানি। আবার ওঙ্কারকে ভালওবাসেন খুব। ওঙ্কার বিয়ে করতে চেয়েছে শুনলে অমত করবেন না।

—বেশ! আমি চেষ্টা করে দেখছি।

দীনদয়াল বিয়ের প্রস্তাবটা তাই উপস্থিত করলেন হরিদয়ালের কাছে।

হরিদয়ালের মত পাবার দিন দুয়েক পরে তিনি পাটনা গেলেন। স্বরূপলাল বহুদিন পরে ছোট ভগ্নীপতিকে দেখে আনন্দিত হলেন। তবে টিপ্পনি কাটতে ছাড়লেন না।

বললেন, শ্বশুরবাড়ির কথা তোমার এখনও মনে আছে তাহলে: আমি ভেবেছিলাম অনেককাল আগেই ভুলে গেছো।

বড় শালার অভিযোগকে খণ্ডন করবার মত কোন জোরালো যুক্তি দীনদয়ালের কাছে নেই। মুঙ্গের থেকে পাটনার দূরত্ব বেশি নয়। ট্রেনে মাত্র ঘণ্টা পাঁচেক সময় লাগে, তা সত্ত্বেও পাঁচ ঘণ্টার জন্যে বছর সাতেকের মধ্যে পাটনায় আসতে পারেন নি তিনি।

গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, আপনাদের ভুলে যাব; কি যে বলছেন! এত ব্যস্ত থাকি যে, ইচ্ছে থাকলেও সময় করে উঠতে পারি না। নইলে দেখতেন, মাসে মাসে আসতাম পাটনায়।

—বাজে কথা একটু কম বল। তুমি নিশ্চয়ই আমার চেয়ে বেশি ব্যস্ত নও? এই ব্যস্ততার মধ্যেও আমি আত্মীয়-কুটুমের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করতে ছাড়ি না।

—অনেকদিন আসা হয় নি দেখেই তো চলে এলাম। আপনার বোনকে নিয়েই আসতাম। শরীরটা ওর বিশেষ ভাল নেই বলে....

স্বরূপলাল উদ্বিগ্ন হলেন।

—কি হয়েছে কৌশল্যার?

—নতুন কোন উপসর্গ নয়। সেই কলিকের ঝামেলা লেগেই আছে।

স্বরূপলাল সিগারেট ধরালেন।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ভাল কথা নয়, এত চিকিৎসা করাচ্ছো তাও সারছে না? কৌশল্যাকে নিয়ে একবার বরং কলকাতা যাও। ট্রপিক্যাল মেডিসিনে দেখাও ভাল করে।

দীনদয়াল মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, যেতে হবে একবার। চব্বিশ ঘণ্টা রোগ-রোগ আর ভাল লাগে না।

অনেক কথা হল শালা-ভগ্নীপতির মধ্যে।

দুপুরে গুরুগম্ভীর খাওয়ার পর ডানলোপিলো পাতা খাটে গা এলিয়ে দিয়ে দুজনে কথার সমুদ্রে ভাসছিলেন। স্বরূপলাল আজ আর গদিতে গেলেন না। ফোন করে প্রয়োজনীয় নির্দেশগুলি দিয়ে রাখলেন কর্মচারীদের।

কথায় কথায় তিনি বললেন, ভাল সময়েই তুমি এসে পড়েছো। কাল দানাপুর যাচ্ছি মেয়ে দেখতে। তুমিও যাবে।

দীনদয়াল অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তিনি এসেছেন ওঙ্কারেরই সম্বন্ধ নিয়ে। এদিকে অন্যত্র পাত্রী দেখতে যাচ্ছেন স্বরূপলাল। পরিস্থিতি বেশ ঘোরাল হয়ে উঠল। বলি-বলি করেও কথাটা তখন বলতে পারলেন না তিনি।

স্বরূপলালের কথা ধরতে পারেন নি—এইভাবে বললেন, মেয়ে দেখতে যেতে হবে? কার জন্যে বলুন তো?

—তুমি যে অবাক করলে হে! কার জন্যে মেয়ে দেখতে যেতে হবে বুঝতে পাচ্ছো না? ওঙ্কারকে কতদিন আর আইবুড়ো করে রাখব বল?

—তা ঠিক! এই বয়সে বিয়েটা হয়ে না গেলে আবার····

দীনদয়ালের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে স্বরূপলাল বললেন, বিপথে যেতে কতক্ষণ? অবশ্য ওঙ্কার সে প্রকৃতির নয়। সিগারেট পর্যন্ত খায় না।

একটু থেমে বললেন, মেয়ে তো অনেক দেখলাম। মনের মত পাওয়া গেল না একটাও। দেখি কাল দানাপুর গিয়ে কি হয়!

দুজনের চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। কাজেই কথাবার্তা আর অগ্রসর হল না। দুজনেই ঘুমের আশ্রয় নিলেন। প্রবল নাকের ডাকে চতুর্দিক প্রকম্পিত হতে লাগল।

নৈশ আহার শেষ হল কাঁটায় কাঁটায় আটটায়। এ-বাড়ির এই রেওয়াজ। শুধু ঘুমতে যাওয়ার পূর্বে এক গেলাস করে পেস্তার সরবতের ব্যবস্থা থাকে। স্বরূপলাল, দীনদয়াল ও ওঙ্কার একই সঙ্গে আহারে বসেছিলেন। স্বরূপলালের আর দুই ভাই পাটনায় উপস্থিত নেই। ব্যবসার কাজে চুনার গেছেন।

খাওয়ার পর স্বরূপলাল সিগারেট ধরালেন। দীনদয়াল মুখে ফেললেন গোটা চারেক পান। ওঙ্কারের বিয়ের বিষয় নিয়েই আলোচনা চলতে লাগল। জনা-তিরিশেক মেয়ের বাপ বছরখানেকের মধ্যে স্বরূপলালের সঙ্গে যোগা-যোগ করেছেন। কিন্তু তিনি পুত্রবধূ করবার মত মেয়ের সন্ধান পান নি একটিও।

দীনদয়াল কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করে বললেন, কাল দানাপুরে গিয়ে মেয়ে দেখে আসার কোন প্রয়োজন নেই। আমি আপনাকে এমন একটি মেয়ের সন্ধান দিতে পারি, যাকে কোনমতেই অপছন্দ করতে পারবেন না।

—বল কি ?

—মেয়েটির বংশ-মর্যাদা আছে, শিক্ষিতা, সুন্দরী…

—টাকা….মেয়েটির বাপের টাকা কেমন আছে, বল ?

—টাকা মোটেই নেই। মেয়ের বাপ স্কুল-মাষ্টার।

বিরক্তমুখে ভ্রূ কুঁচকে স্বরূপলাল তাকালেন দীনদয়ালের দিকে। অর্থাৎ, তোমার সাহস তো কম নয় ! হা-ঘরের মেয়েকে ওঙ্কারের জন্যে সুপারিশ করা ! হলেই বা বংশ-মর্যাদাসম্পন্না, সুন্দরী, শিক্ষিতা—যে মেয়ের বাপের টাকা নেই, স্বরূপলালের কাছে সে মেয়ের মূল্য এক কপর্দকও নয়।

—তুমি কি আমার সঙ্গে মস্করা করছো দীনদয়াল ? হাজার ত্রিশেক টাকার কমে ওঙ্কারকে যে ছাড়ব না, এ-কথা কে না জানে ?

—আপনি আমাকে শেষ পর্যন্ত বলতে দিন। আপনার সঙ্গে মস্করা করবার মত স্পর্ধা আমার নেই। মেয়েটি আমার ভাইঝি। আমি কাজলের কথা বলছিলাম।

স্বরূপলাল হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। দীনদয়াল যে এই ধরনের প্রস্তাব করতে পারেন, তাঁর চিন্তার অতীত ছিল। ভগ্নীপতির পাটনায় আসার উদ্দেশ্যও তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। বসে ছিলেন। উঠে দাঁড়ালেন স্বরূপলাল। কয়েক চক্কর পায়চারি করলেন।

তারপর বললেন, তোমার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারছি না বলে কিছু মনে কর না। ওঙ্কারকে ত্রিশ হাজার টাকার কমে ছেড়ে দিলে ওর প্রতি অবিচার করা হবে।

—আপনার টাকার অভাব নেই। ওঙ্কারের বিয়েতে নাই বা নিলেন কিছু। দশজনকে দেখাবার মত বৌ পাচ্ছেন, এও তো কম কথা নয়!

—ও প্রসঙ্গ বাদ দাও দীনদয়াল। আমি তোমার প্রস্তাবে কখনই রাজি হব না।

দীনদয়াল এবার মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করলেন।

—প্রস্তাব আমি কখনই করতাম না। বহুদিন থেকেই জানি, ছেলের বিয়েতে আপনি কিছু লাভ করতে চান। আপনার দাবী পূরণ করবার ক্ষমতা আমার দাদার কোনদিনই হবে না। প্রস্তাব নিয়ে আমি এসেছিলাম ওঙ্কারের পক্ষ থেকে।

—ওঙ্কারের পক্ষ থেকে!

এভারেষ্টের চূড়া থেকে স্বরূপলাল যেন গড়িয়ে পড়লেন।

—বলছো কি তুমি? ওঙ্কার তোমায় পাঠিয়েছে?

—ওঙ্কার ঠিক আমায় পাঠায় নি। সে তার পিসিকে নিজের মনের কথা বলেছিল। কৌশল্যা আপনার কাছে আমাকে পাঠাল।

অসম্ভব দ্রুত পায়চারি করতে লাগলেন স্বরূপলাল। তাঁর মুখ দিয়ে অজস্র গালাগাল বেরিয়ে আসতে লাগল। গালাগালগুলো অবশ্য পুত্রকে উদ্দেশ্য করেই। একনাগাড়ে কিছুক্ষণ বকে যাবার পর তিনি থামলেন। হাঁপিয়ে পড়েছেন মনে হল।

শেষে দম নিয়ে বললেন, অ্যাঁ—ঘন ঘন মুঙ্গেরে যাওয়ার কারণ এতদিনে জানা গেল। আমার ছেলে হয়ে কিনা, সিনেমার নায়কদের মত …অ্যাঁ…

—আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। কাজলের সঙ্গে ওঙ্কারের ভালভাবে পরিচয় পর্যন্ত নেই।

—তুমি থাম! তোমার কথায় আমি আর বিশ্বাস রাখতে পারছি না। সেই হতভাগা গেল কোথায়? ওঙ্কার…ওঙ্কার…

স্বরূপলালের গর্জনে নিস্তব্ধ বাড়ি গমগম করতে লাগল। ওঙ্কার পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। আহ্বানের জন্যে প্রস্তুত ছিল বোধহয়। ছেলেকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে স্বরূপলাল ফেটে পড়লেন।

—এ সমস্ত কি শুনছি?

নতমুখে ওঙ্কার দাড়িয়ে রইল।

—চুপ করে থেকো না। আমার কথার উত্তর দাও।

ছেলের পিছু পিছু দীনদয়ালের বড় শালাজ ঘরে এসেছিলেন।

ওঙ্কারের বদলে তিনিই উত্তর দিলেন, চেঁচিয়ে পাড়া মাত কেন করছো বলতো? ছেলেটার ওপর এত তম্বিই বা করছো কেন?

—করব না! কি হয়েছে শুনেছো?

—আমার শুনতে কিছু বাকী নেই। ওঙ্কার নিজের ঘরে যা তুই।

দীনদয়ালের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনিও শুয়ে পড়ুন গিয়ে।

দীনদয়াল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ওঙ্কার তাঁকে অনুসরণ করল।

ঘরে রইলেন শুধু স্বামী-স্ত্রী। এরপর কি হবে জানেন দীনদয়াল। ছেলের এই বিয়েতে মত দিতে হবে স্বরূপলালকে। বিকেলে বড় শালাজের কাছে নিজের মনের কথা পেড়েছিলেন দীনদয়াল। কাজলকে তিনি দেখেছিলেন। তাকে তাঁর অপছন্দ নয়। কাজলের মত বৌ তিনি আর কোথায় পাবেন? এদিকে কর্তা খেপে আছেন টাকা-টাকা করে। আশার কথা, কর্তাকে কিভাবে ঘায়েল করতে হয় তা তিনি জানেন।

দীনদয়ালকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার ভাইঝি এ-বাড়ির বৌ হয়ে আসবেই। কর্তার মত যে কোন উপায়ে হোক আমি আদায় করতে পারব।

আর সকলের মত দীনদয়ালও জানতেন, স্বরূপলাল অন্যের ওপর যতই দাপট দেখান না কেন, স্ত্রীর কাছে মিইয়ে থাকেন। স্ত্রীকে কেন যে তিনি

এত ভয় করে চলেন, তার কারণ কেউ জানে না। সুতরাং দীনদয়াল নিশ্চিন্ত আছেন।

দানাপুর ফাষ্ট প্যাসেঞ্জার পাটনা থেকে ছাড়ে বেলা বারোটায়। জামালপুর পৌঁছায় বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। ওই গাড়িতেই দীনদয়াল আজ বাড়ি ফিরবেন। ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে তিনি বেরিয়ে ছিলেন পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করবার জন্যে।

ফিরলেন সাড়ে নটার পর।

স্বরূপলাল বিমর্ষভাবে বসে ছিলেন বাইরের ঘরে।

দীনদয়াল বললেন, দেখা-সাক্ষাতগুলো সেরে এলাম। আজ দানাপুর ফাষ্ট প্যাসেঞ্জারে বাড়ি ফিরব ভাবছি।

—আজই ফিরবে?

—হ্যাঁ। আর এখানে অপেক্ষা করে কি হবে, বলুন?

স্বরূপলাল সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, কাল যেও বরং। ইতিমধ্যে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা আমার পাকাপাকি হয়ে যাক!

দীনদয়াল বিস্ময়ের ভান করলেন।

—কোন্ বিষয়ের কথা বলছেন, বলুন তো?

—ওঙ্কারের বিয়ের বিষয়। তুমিও অনুরোধ করছো, তোমার বৌদিরও আন্তরিক ইচ্ছে—তাছাড়া আমিও চিন্তা করে দেখলাম, তোমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাওয়াই ভাল।

—রামচন্দ্র আপনার মঙ্গল করুন। আপনি আমার দুস্থ দাদাকে প্রাণ দিলেন বলা চলে।

—আসল কথা কি জান? আজকালকার ছেলে তো, অন্যত্র বিয়ে দিতে গেলে হয়তো ট্রেনের তলায় গলা দিয়ে বসবে। বুদ্ধি-বিবেচনার ধার দিয়েও তো এরা যায় না। কি যে দিনকাল পড়েছে! তোমার বৌদিও ওই কথা বলছিলেন। আগে ছেলে, তারপর টাকা।

কথার শেষে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন স্বরূপলাল।

তাঁর ব্যথা যে কোথায়, দীনদয়াল তা জানেন।

তিনি সমবেদনার সুরে বললেন, ঠিকই বলেছেন। আজকালকার ছেলেদের মন-মেজাজ বোঝা আমাদের সাধ্যের বাইরে। আপনার ওই তো শিবরাত্রের সল্‌তে। ওর ইচ্ছেকে মেনে নিয়ে ভালই করলেন। বলুন এবার, কবে মেয়ে দেখতে যাবেন ?

—মেয়ে দেখে আর কি হবে ? ছেলের পছন্দ, তার মায়ের পছন্দ, আর মেয়ে দেখে কি করব ?

—তাহলেও···

—না, না, ও-সমস্ত ঝামেলা থাক। তুমি তোমার দাদাকে শুধু একবার পাঠিয়ে দিও। হাজার হলেও আমি ছেলের বাপ, আমার কাছে তাঁর একবার বোধহয় আসা দরকার।

—নিশ্চয়ই—একশো বার। দিন দশেকের মধ্যেই আমি দাদাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব।

এরপর আর গোলমাল রইল না। হরিদয়াল ছোটভাইকে সঙ্গে করে পাটনায় এলেন। পঞ্জিকা দেখে দিন স্থির হল। মাঝের ক-টা মাস যাবে, বিয়ে হবে সেই অঘ্রাণে।

···· ··········অন্দর থেকে বাইরে এসে হরিদয়াল দেখলেন চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা। অবশ্য করণীয় কাজগুলি যাদের করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা কিছুই করে নি বলতে গেলে। বিরক্তিতে তাঁর মন ভরে উঠল। তিনি একা মানুষ, সব দিক সামলাবেন কিভাবে ? দীনদয়াল আর ওমপ্রকাশ কাছে থাকলে অবশ্য কোন অসুবিধে হত না। তাঁরা বরযাত্রীদের আদর আপ্যায়নে ব্যস্ত। আজ সকালের ট্রেনেই ওঁরা এসেছেন। ওঁদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে দীনদয়ালের বাড়িতে।

সমস্ত দিক সামলাবার জন্যে হরিদয়াল নিজের কয়েকজন ছাত্রকে ডেকে-ছিলেন। তাদের মধ্যে একজনকে বললেন, গোপাল ত্রিপল নিয়ে এসেছে ?

—না স্যার।

—এখনও আসে নি ? গেছে তো প্রায় ঘণ্টা তিনেক আগে !

—ষ্টোরকিপারকে বোধহয় পায় নি স্যার, তাই এত দেরী হচ্ছে।

বিরক্তির সুরে হরিদয়াল বললেন, ষ্টোরকিপারের কাছে যাবার দরকারটা কি ? কাল আমি হেডমাষ্টার মশাইয়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ত্রিপল ষ্টোর থেকে বার করিয়ে দারোয়ানের জিম্মায় রেখে এসেছি। গোপাল যাবে দারোয়ানের কাছে। তা নয়, গেল ষ্টোরকিপারের কাছে !

—আমি যাব, স্যার ?

—না, থাক। তোমার ফিরতেও আবার কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে। আমি নিজেই যাচ্ছি।

তিনি বারান্দা থেকে পথে নামলেন। নিজে গিয়েই স্কুল থেকে ত্রিপল নিয়ে আসবেন। ত্রিপল না হলে চলবে না। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে ছাদে। আচ্ছাদনের ব্যবস্থা রাখতেই হবে, নইলে লোকে ঠাণ্ডায় কষ্ট পাবে। এদিকে চারটে বেজে গেছে। এখনও ত্রিপল টাঙানো তো দূরের কথা এসে পৌঁছায় নি পর্যন্ত। কখন যে কি হবে····

একরাশ চিন্তা নিয়ে সবে পথে তিনি পা দিয়েছেন, স্নেহপ্রভাকে আসতে দেখলেন।

ঘোমটা একটু টেনে দিয়ে স্নেহপ্রভা পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। হরিদয়াল সসম্ভ্রমে বললেন, আপনার আসতে বেশ বিলম্ব হয়ে গেল ?

মৃদুগলায় স্নেহপ্রভা বললেন, খোকার আসবার কথা ছিল। ওর অপেক্ষায় থেকে দেরি হয়ে গেল।

স্ত্রীর এই বান্ধবীকে অত্যন্ত সম্মান করেন হরিদয়াল।

—কাঞ্চনের আসবার কথা ছিল ?

—হ্যাঁ। আজ আর বোধহয় এল না।

স্নেহপ্রভা বারান্দা মাড়িয়ে অন্দরে চলে গেলেন।

দুই

মাড়োয়ার পাশে পাশে আলপনা দিচ্ছিলেন মনোরমা। যদিও এঁদের সমাজে আলপনা দেওয়ার রেওয়াজ নেই। মনোরমা নিজের ছোটবেলাকার অভ্যাস এতদিনেও ছাড়তে পারেন নি। বাড়িতে কোন শুভকাজ হলেই আলপনা দিয়ে থাকেন। সেখানে আর কেউ ছিল না। কৌশল্যা ছিলেন ভাঁড়ারে।

স্নেহপ্রভা এলেন।

মুখ তুলে মনোরমা বললেন, খুব যাহোক! মেয়ের বিয়ে, কোথায় সকাল সকাল আসবি, তা নয়, এলি দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পর।

—রাগ করিস না ভাই। সকালেই আসতাম। মাঝরাতে খোকার তার পেলাম। ও আসছে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে। ট্রেনের অপেক্ষা করছিলাম।

—খোকা এসেছে?

—কই আর এল!

—তাহলে বোধহয় ন-টার ট্রেনে আসবে।

—এলে বাঁচি। সময়মত যখন আসতেই পারবে না, তখন তার করা কেন বলতো? আমরা যে চিন্তিত হব, তা কি ওর অজানা?

—কোন কারণে হয়তো ট্রেন ফেল করেছে, ন-টার ট্রেনে ঠিক আসবে দেখিস।

স্নেহপ্রভা মাড়োয়ার দিকে তাকালেন।

নতুন খড়ে-ছাওয়া বর্ণাঢ্য মাড়োয়া যেন হাসছে। বহু অবাঙালীদের বিয়েতে উপস্থিত থেকেছেন স্নেহপ্রভা। সত্যি কথা বলতে কি, এত সুন্দর বিবাহ-মণ্ডপ আগে তিনি দেখেন নি।

বললেন, নতুন খড়ে তৈরী হয়েছে দেখছি! ওমা, সোলার ফুলগুলো এখনও লাগাস নি? ওঠ—ওঠ—

মনোরমা মৃদু হেসে বললেন, দেখছিস তো আলপনা দিচ্ছি।

—আলপনা আমি দিয়ে দিচ্ছি। তুই ফুলগুলো এখুনি লাগিয়ে দে। ভুল হয়ে যাবে নইলে।

—একলা হাতে আর কত করি বল না ?

উঠে দাঁড়িয়ে আড়ামোড়া ভাঙলেন মনোরমা। অনেকক্ষণ ধরে ঝুঁকে বসে তিনি আলপনা দিচ্ছিলেন। স্নেহপ্রভা পিটুলীর বাটিটা টেনে নিয়ে মাটিতে বসলেন।

—ওকি, ফর্সা শাড়ীটা নিয়ে মাটিতে বসলি ?

—ফর্সা না ছাই! একথা আমি বলব বাপু— স্নেহপ্রভা বললেন, তোর বৌ কিন্তু কাজটা ভাল করল না। এই কাজ-কর্মের সময় তার বাপের বাড়িতে বসে থাকাটা কি উচিত কাজ হয়েছে ?

—কি আর বলব, আমার ভাগ্য! একে ছেলেটাকে নিয়ে জ্বলে-পুড়ে মরছি, তারপর এমন বৌ জুটল—সেও হাড়মাস ভাজা ভাজা করে খেলে।

কোনরকমে দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে মনোরমা কথাটা শেষ করলেন।

—আমারও তো ওই ভয়, ভাই। খোকার এবার বিয়ে দিতে হবে। বৌয়ের হাতে আমার কত খোয়ার অপেক্ষা করছে কে জানে ?

বছর দুয়েক হল ওমপ্রকাশের বিয়ে হয়েছে।

ছাপরার এক ধনাঢ্য পরিবারে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন হরিদয়াল। বৌকে নিয়ে অনেক আশা-আকাঙ্খা ছিল তাঁদের। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির কাউকে সে খুশি করতে পারল না। বড়লোকের আদুরে মেয়ে অসম্ভব মুখরা। বলতে গেলে, মুখ বুজে অনেক অসহণীয় পরিস্থিতি সহ্য করে গেছেন হরিদয়াল ও মনোরমা।

যাহোক ভাবে দিন কাটছিল। মাস চারেক আগে ওমপ্রকাশের শ্বশুর এসে মেয়েকে নিয়ে গেছেন ভাইপোর বিয়ে উপলক্ষে। কথা ছিল, দিন দশেক বৌ ওখানে থাকবে। তারপর ওমপ্রকাশ নিয়ে আসবে তাকে। কিন্তু এতদিন হয়ে গেল মেয়েকে ওঁরা পাঠালেন না। ইতিমধ্যে ওমপ্রকাশ দুবার গিয়েছিল, কোন ফল হয় নি। সম্প্রতি ওমের শ্বশুর জানিয়েছেন মেয়ের শরীর খারাপ। শরীর ভাল হলেই তাকে পাঠিয়ে দেবেন।

—মনের মত বৌ ঘরে থাকলে কি আর আমায় খেটে মরতে হয়? কি ভাগ্য নিয়েই এসেছিলাম? জীবনে কি কোন একটা ব্যাপারে সুখী হতে পারলাম?

—আজকের দিনে আর দুঃখ করিস না মনো।

—ভাবি করব না। তোকে দেখলে আর চাপতে পারি না ভাই। তোকে ছাড়া আর তো কাউকে মনের কথা বলতে পাবি না।

স্নেহপ্রভা কথার মোড় ঘোরালেন।

—কাজল কোথায়?

—নিজের ঘরে আছে। ওর বন্ধু উর্মিলার সঙ্গে গল্প করছে বোধহয়। এখন ভালয়-ভালয় কাজটা চুকে গেলে বাঁচি।

—চুকে যাবে বৈকি। আলপনা দিতে দিতে স্নেহপ্রভা বললেন, সব সময় তোর মনমরা ভাব আমার ভাল লাগে না।

মনোরমা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বলা হল না। কাজল এসে দাঁড়াল। মনোরমার মতই সুশ্রী সে। রঙটা অবশ্য দুধে-আলতায় নয়। একহারা ও দীর্ঘাঙ্গী। মুখ-চোখ অত্যন্ত শুকনো দেখাচ্ছে। উপোস করে আছে বলে বোধহয়। তাছাড়া অসম্ভব গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে। মনোরমা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

কাজল ভরাট গলায় বলল, মা, আলমারির চাবিটা দাও তো।

মনোরমা আঁচল থেকে চাবির গোছা খুলে দিলেন। কাজল চাবি হাতে নিয়ে সেখানে আর দাঁড়াল না। নিজের ঘরে ফিরে গেল।

উর্মিলা তখন কনে-সাজের জিনিসপত্তরগুলো গুছিয়ে রাখছিল।

কাজলকে ফিরে আসতে দেখে বলল, কোথায় গিয়েছিলি?

—মার কাছে। আলমারির চাবি আনতে।

—আজকের দিনে তোর এত গম্ভীর থাকাটা মোটেই উচিত হচ্ছে না। আমার ছোটবেলায় বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের দিন ভয়ে আড়ষ্ট হয়েছিলাম। তুই তো ছোট মেয়ে নোস। তোর তো হাসিখুশি থাকার কথা।

কাজল অন্যমনস্কভাবে বলল, থাকতে পারছি কই?

—কেন থাকতে পারছিস না? তখন থেকে এত সাধ্য-সাধনা করছি;

কি হয়েছে আমায় বল না ভাই !

কাজল জানে তার মনের ব্যথা যদি কেউ বুঝতে পারে, সে ঊর্মিলা। তবু এতদিন সমস্ত কথা খুলে বলতে পারে নি তাকে। কেন যে পারে নি, তা সে নিজেও জানে না। এখন বলবে। অথৈ জলে ডোববার পূর্বমুহূর্তে বলবে ঊর্মিলাকে।

—তোকে এখন আমি সব কথাই বলব ঊর্মি। বলব বলেই তো মার কাছ থেকে চাবির গোছাটা নিয়ে এলাম।

অবাক হয়ে ঊর্মিলা বলল, এর সঙ্গে চাবির গোছার সম্পর্ক কি ?

—আলমারিতে একগাদা চিঠি আছে। একটা লোকের কদর্য রূপ ছত্রে ছত্রে ফুটে আছে ওই সমস্ত চিঠিতে। মানুষ কত নিচে নেমে গেলে যে ওইভাবে কোন মহিলাকে কিছু লিখতে পারে—

—তুই কি বলছিস আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

কাজল কোন কথা না বলে আলমারি খুলে খানকয়েক চিঠি শাড়ির তলা থেকে বার করল। ঊর্মিলার দিকে চিঠিগুলো এগিয়ে ধরে বলল, পড়ে দেখ।

কাজল তার ভাবী স্বামী ওঙ্কারের সঙ্গে পরিচিত বেশ কিছুদিন থেকেই। অবশ্য পরিচয় বলতে যা বোঝায়, তাদের মধ্যে সেরকম কোন সম্পর্ক ছিল না। তবে—

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ করে কাজল পাটনা থেকে মুঙ্গেরে এসেছিল। তখন নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ। যদি পাশ করে, বাবা বি.এ. পড়াবেন কিনা কে জানে ! যদি আরো দু-বছর পড়ান, কি ভালই না হয় ! গ্র্যাজুয়েট হবার আকাঙ্খাটা মিটে যায় তাহলে।

পাটনায় কিছু করবার ছিল না বলেই মুঙ্গের চলে এসেছে। সত্যি কথা বলতে কি, এখানে সময় কাটানো বেশ কষ্টকর। ঊর্মিলা পর্যন্ত নেই। তার সঙ্গেও যে কিছুক্ষণ গল্প করবে সে পথও বন্ধ। বরের সঙ্গে গেছে গ্রামের বাড়িতে।

কিছু করবার না থাকায় দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর কাজল কাকার বাড়ি

গেল। কৌশল্যা সবে পান মুখে দিয়ে শুতে যাচ্ছিলেন। কাজলকে দেখে উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন ওমা, তুই....

কাজল সহাস্যে বলল, তোমার ঘুমের দফা-রফা করতে এলাম।

—মেয়ের কথা শোন! বেশ করেছিস। আয়, আয় বোস। কবে এলি?

—কাল এসেছি কাকীমা।

—তোর কাকা বলছিলেন বটে, এই সপ্তাহেই তোর পাটনা থেকে ফেরার কথা।

দীনদয়ালের স্ত্রী কৌশল্যা মানুষ হিসেবে মন্দ নন। সবসময় হাসিখুশি থাকেন। পান খান অসম্ভব। বিরাট পানের বাটা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। পানের প্রতি তাঁর এমন আসক্তি যে, একবার দীনদয়ালকে ধরে বসলেন, মুঙ্গেরের কাছে পাটামে যে অজস্র পানের বরজ আছে, তার মধ্যে একটা কিনতে। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দীনদয়াল সে যাত্রায় রক্ষা পেয়েছিলেন। ছেলেমেয়ে তাঁর নেই। তাঁর ধারণা অল্প বয়সেই অসম্ভব মোটা হয়ে গিয়েছিলেন বলে তিনি মা হতে পারলেন না। তাঁর মাতৃত্বের আকাঙ্খা অপূর্ণ রয়ে গেছে—তাই বোধহয় কাজল ও ওমপ্রকাশকে তিনি এত স্নেহ করেন।

—চলে তো এলাম..., কাজল বলল, এখন খারাপ লাগছে। এখানে সময় কাটানোই কষ্টকর। বাড়িতে একটা নতুন বই পর্যন্ত নেই। তাক-ভর্তি মান্ধাতা আমলের বই। সেই বইগুলো আর কত পড়ব বলতো?

কৌশল্যা দুটো পান গালে ফেলে দিলেন। একচিমটি জর্দাও ফেললেন। বারকয়েক চিবিয়ে বললেন, পরীক্ষা হয়ে গেছে, এখন আর পাটনায় থেকে কি করবি?

—ওখানে থাকা মানেই তো খরচ। কিন্তু এখানেই বা আমার সময় কাটে কিভাবে?

—তোর সময় আমি কাটিয়ে দেব। রোজ দুপুরে চলে আসবি এখানে। সেলাই-ফোঁড়াই নিয়ে দুজনের সময় বেশ কেটে যাবে।

—তাই করতে হবে। একটু থেমে কাজল বলল, আচ্ছা কাকীমা, বাইরের ঘরে দেখলাম বিছানা পাতা রয়েছে। কাকা আজকাল ওখানে শুচ্ছেন নাকি?

—বাইরের ঘরে শোবেন তোর কাকা ? যা ভীতু মানুষ ! দিন তিনেক হল ওঙ্কার এসেছে পাটনা থেকে। সেই শুচ্ছে বাইরের ঘরে।

—ওঙ্কার কে কাকীমা ?

—তুই দেখিস নি তাকে ? আমার ভাইপো। মাঝে মাঝে আসে পাটনা থেকে।

—ও !

—আজকালকার দিনে ওঙ্কারের মত ছেলে দেখা যায় না। কোথাও বেরিয়েছে বোধহয়। ফিরে এলেই তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

দ্রুতগলায় কাজল বলল, থাক, আর আলাপ করিয়ে দিতে হবে না।

—ভেতরে আসতে পারি পিসিমা ?

—ওম, নাম করতে-না-করতে হাজির ! আয়—আয়—

ওঙ্কার ঘরে এলো।

টকটকে গায়ের রঙ তার। মেয়েলী ছাঁচের মুখ। একমাথা ঘন কোঁকড়া চুল। উচ্চতায় অবশ্য সে খুব বেশি নয়। কাজল পলকের জন্যে ওঙ্কারের মুখের দিকে তাকিয়েই মাথা নত করল। একনজরেই তার চিনে নিতে কষ্ট হল না। কয়েক মাস আগে এই ছেলেটাই পাটনায় গান্ধী ময়দানে সঙ্গীত-সম্মেলনে তাকে দেখে বিশ্রী মন্তব্য করেছিল। ভিড়ের মধ্যে তাকে ধাক্কা দিয়ে চলে গিয়েছিল। দুর্বিসহ রাগ সেদিন উতলা করেছিল কাজলকে।

এই ছেলেটা কাকীমার ভাইপো নাকি !

কৌশল্যা আবার বললেন, ওকে সঙ্কোচ করতে হবে না ! কাজল, আমার ভাসুরঝি। পাটনায় পড়ে।

কাজল পিসিমার ভাসুরঝি, একথাটা অবশ্য নতুন। তবে ও যে পাটনায় পড়ে, তা বিলক্ষণ জানা আছে ওঙ্কারের। মনে মনে পুলকিত হল সে। নিজেকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিল এই সময় মুঙ্গেরে বেড়াতে আসার জন্যে।

বলল, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পানের পিক ফেলে কৌশল্যা বললেন, তোকে আর সাহেবি ঢঙে কথা বলতে হবে না। লেখাপড়া শিখে সাহেব হয়ে উঠেছিস, না ?

ওঙ্কার মৃদু হেসে বলল, সাহেব হয়ে উঠি নি পিসিমা। ওটা শিষ্টাচার। আপনি কি বলেন ?

কাজল কিছু বলল না। অসম্ভব বিরক্ত হয়ে উঠল নিজের ওপর। কেন আসতে গেল সে এ-বাড়িতে ? সমস্ত দুপুর যদি ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিত, তাহলেই বা কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত ?

—ও কি বলবে ? কোথায় গিয়েছিলি দুপুর রোদ্দুরে ?

—চকে গিয়েছিলাম।

তারপর অজ্ঞতার ভান করে বলল, উনি কলেজে পড়ছেন বোধহয় ? কোন্ ইয়ার হল ?

—ওকেই প্রশ্ন কর না ?

কাজল একটু অবাক হল। ওঙ্কার কি ওকে চিনতে পারে নি ? নইলে এত সহজভাবে কথা বলতে পারত কি ? নিশ্চয়ই চিনতে পারে নি।

—কোন্ ইয়ার হল আপনার ?

কাজল অনিচ্ছার সঙ্গে উত্তর দিল, ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছি।

—উওমেন্স কলেজ, না মগধমোহিনী, কোথা থেকে পরীক্ষা দিলেন ?

—উওমেন্স কলেজ।

দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল কাজল, দেড়টা বেজে গেছে। কৌশল্যার দিকে তাকিয়ে বলল, কাকীমা, এবার আমি উঠছি।

—উঠবি কি ! এই তো এলি। বোধহয় পনের মিনিটও হয় নি এখনও।

মিথ্যার আশ্রয় নিতে হল।

—ঊর্মিলার আসবার কথা আছে দুপুরে। আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। এখন না গেলে ও হয়তো ফিরে যাবে।

উত্তরের অপেক্ষা না করে, কোনদিকে না তাকিয়ে কাজল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দিন দুয়েক পরে কৌশল্যা এ-বাড়িতে এলেন।

মনোরমা তখন সোডা দিয়ে কাপড় সিদ্ধ করছিলেন। উনুনের আঁচে

তাঁর ফরসা মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

কৌশল্যা বললেন, তোমার কাজের কামাই নেই দিদি। যখনই আসি, দেখি কিছু-না-কিছু একটা করছো।

মুখে হাসি টেনে মনোরমা বললেন, আমি না করলে এই পাহাড় প্রমাণ কাজ কে করবে বল?

—বাড়িতে প্রাণী তো চারটি। পাহাড় প্রমাণ কাজ তুমি যোগাড় কর কোথা থেকে?

—লোক দিয়ে কাজ করাস তো, তুই বুঝবি না। ছোট, তুই ভাই গিয়ে ঘরে বোস, আমি এগুলোর ব্যবস্থা করেই আসছি।

—ওই ডাঁই কাপড়ের ব্যবস্থা করতে তোমার দু'ঘণ্টা লাগবে। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এখুনি।

কৌশল্যা উনুনের ওপর থেকে কড়াসমেত কাপড়গুলো মাটিতে নামিয়ে রেখে বললেন, এবার চল ঘরে।

সস্নেহে মনোরমা বললেন, তুই এখনও ছেলেমানুষ রয়ে গেলি।

দুজনে ঘরে এসে বসলেন। ওঁদের গল্পের মাঝে কাজল এল।

কৌশল্যা বললেন, হ্যাঁরে কাজল, যাস না কেন?

কাজল ইতস্তত করে বলল, দুপুরে ঘুমিয়ে পড়ি।

—এই বয়সে প্রত্যহ দুপুরে ঘুমিয়ে পড়লে মোটা হয়ে যাবি মা। আমার অবস্থা দেখ না, গুরুজনের বারণ তখন যদি শুনতাম, আমার শরীর কি এই ওলের ঢিবি হত!

সখেদে তিনি গোটা তিনেক পান মুখে দিলেন।

মনোরমা বললেন, কিছু তো করবার নেই। পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে।

—আগে ছুটি-ছাটায় আসত, তাও পড়াশোনা করত এখানে। এখন তো সে পাটও নেই।

কাজল বলল, বাবা স্কুল-লাইব্রেরী থেকে গোটাকয়েক বই জোগাড় করে দিয়েছেন, তাই রক্ষে। নইলে তো ভেবে রেখেছিলাম, পড়ার বইগুলোই আবার পড়তে আরম্ভ করব।

কৌশল্যা বললেন, তোর একঘেয়েমী কাটাবার অন্তত একদিনের ব্যবস্থা

আমি করেছি।

—কি কাকীমা ?

—খড়্গপুর লেকে যাব ঠিক করেছি। তুই যাবি আমাদের সঙ্গে। দিদি, তোমাকেও ছাড়ছি না। তিনশো পঁয়ষট্টি দিন যে বাড়ির মধ্যে বসে থাকবে, তা হবে না।

—আমায় আবার কেন ছোট ? আমার গেলে কি চলে ? কত কাজকর্ম বলতো! কাজল যাবে বৈকি!

—কিন্তু আমি কি করে যাব—আমার যে···

কথাটা কাজল অর্ধ-সমাপ্ত রাখল।

—কেন, তোর আবার কি হল ? তোর জন্যেই এত কাণ্ড-কারখানা আর তুই যাবি না ?

—আসল কথা কি জান····

—আসল কথা জেনে আমার কাজ নেই। আটটার মধ্যে কাল তৈরি হয়ে থাকবি। আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব।

কৌশল্যা আর বসলেন না। বিদায় নিলেন।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে মনোরমা বললেন, ছোট যা বলে গেল তাই করবে। তৈরি হয়ে থাকবে কাল আটটার সময়।

—কিন্তু····

—আমি তোমায় কোন কথা বলি না। শুনবে না জেনেই বলি না। এখন না বলে পারছি না। তোমার বাপ-কাকার মধ্যে কিছুদিন হল মিল হয়েছে। এই না যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে যদি আবার মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়, পরিতাপের কথা হবে।

কথা শেষ করে মনোরমা রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

খড়্গপুর যেতে কাজলের যে খুব আপত্তি, তা নয়। বরং যাবার প্রবল ইচ্ছে আছে। তার ভয় শঙ্করকে। সেকি আর যাবে না খড়্গপুর ? হয়তো তারই ইচ্ছায় এই পরিকল্পনা রূপ নিয়েছে।

তার আপত্তির কারণ কাউকে বোঝানো যাবে না। অথচ না গেলে পরে সে হয়তো অনেক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অগত্যা কাজলকে

খড়্গপুর যেতে হল। সে যা ভেবেছিল, বর্ণে বর্ণে তা সত্য প্রমাণিত হল। যাওয়ার পথে কৌশল্যার কাছ থেকে জানতে পারল, ওঙ্কারের ইচ্ছেতেই এই পিকনিকের ব্যবস্থা হয়েছে।

দীনদয়ালের ষ্টেশন ওয়াগন আছে। সিক্সটিন সিটেড গাড়িটা। অবশ্য এত লোক নেই দলে। ড্রাইভারের পাশে বসেছেন দীনদয়াল। তাঁর পাশে ওঙ্কার আর জনার্দন মিশ্র। জনার্দন দীনদয়ালের বিশিষ্ট বন্ধু। ভেতরের দিকে আছেন কৌশল্যা, কাজল, জনার্দনবাবুর স্ত্রী এবং তাঁর দশ বছরের ছেলে। তাছাড়া সঙ্গে আছে বাসন-পত্তর, সতরঞ্চি, জনতা ষ্টোভ গোটাকয়েক, গ্রামোফোন ইত্যাদি।

একজন চাকর ভোরের বাসেই রওনা হয়ে গেছে সেখানে। সে জায়গা পরিষ্কার করে উনুন পেতে রাখবে, কাঠ কুড়িয়ে রাখবে—কি করতে হবে-না-হবে সমস্ত তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন কৌশল্যা। চাল, ডাল, কাঁচা তরকারি, মাংস সবই পাঠানো হয়েছে তার সঙ্গে।

রওনা হওয়ার সময় দীনদয়াল বললেন, এত ষ্টোভ নিয়ে যাচ্ছ কেন? উনুন তো পাতা হবেই!

—সাবধানের মার নেই! তাছাড়া ভাজাভুজি ষ্টোভেই তো হয়ে যাবে।

বেলা দশটার সময় দীনদয়ালের ষ্টেশন ওয়াগন খড়্গপুরের লেকের ধারে এসে পৌঁছল। সকলে নামলেন গাড়ি থেকে। চাকরটা ছুটে এল। বুদ্ধি করে সে চায়ের জল উনুনে চাপিয়ে রেখেছিল। গাড়ি থেকে সতরঞ্চি নামিয়ে একটা সেগুনগাছতলায় পাতল। সকলে শ্রান্তভাবে বসে পড়লেন। যদিও গাড়িতে এসেছেন, তবুও শ্রান্তির হাত থেকে নিস্তার নেই। চাকরটা সকলের হাতে হাতে চায়ের পেয়ালা তুলে দিল।

চা শেষ করে দীনদয়াল বললেন, বেশ জায়গা! তুমি তো এখানে প্রথম এলে, কেমন লাগছে বল?

—চমৎকার! আকাশের দিকে তাকিয়ে ওঙ্কার বলল, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে বন্দুক থাকলে ভাল হত।

—খুব ভুল হয়ে গেছে তো! পরে না হয় আরেকবার বন্দুক নিয়ে আসা যাবে, কি বল হে জনার্দন?

জনার্দন খইনি টিপছিলেন। বললেন, যা বলেছো! মোটরে তো মাত্র কয়েক ঘণ্টার রাস্তা, এলেই হল!

কাররার ঝাঁককে দূরে নামতে দেখা গেল। ওখানে বোধহয় ধানের ক্ষেত আছে। কাররা ধান খেতে খুব ভালবাসে। দুরন্ত পাখিগুলোর দিকে তাকিয়ে দীনদয়াল বললেন, বন্দুক সঙ্গে থাকলে খাওয়াটা আমাদের বেশ জোর হত। এক একটা পাখির ওজন আড়াই সের, তিন সেরের কম হবে না।

ওদিকে কৌশল্যা ও জনার্দনবাবুর স্ত্রী রান্না-বান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কি কি রান্না হবে, তাব মেনু আগে থেকেই স্থির করা ছিল। বেশি হাঙ্গামার মধ্যে যাবেন না কৌশল্যা। ভাত আর মাংস। গোটাকয়েক ভাজাও অবশ্য হবে। অড়হর ডাল দিয়ে প্রথম মুখে খেতে খারাপ লাগবে না। তাছাড়া লাড্ডু তো আছেই। কাজল গেল কাকীমাকে রান্না-বান্নায় সাহায্য করতে।

কৌশল্যা কিন্তু তাকে উনুনের কাছে ঘেঁষতে দিলেন না।

বললেন, পাকা বুড়ি! যা এখান থেকে। তোকে কি রান্না কবার জন্যে সঙ্গে নিয়ে এলাম এখানে? বেড়িয়ে-চেড়িয়ে দেখ জায়গাটা।

কাজল খড়কপুর এই প্রথমবার আসছে না। ছোটবেলায় আরেকবার এসেছিল। বয়স তখন তার দশ। একটা বাঁধা গণ্ডির মধ্যে থেকে জায়গাটার ওপর চোখ বুলিয়ে গিয়েছিল মাত্র। স্বাধীনভাবে বেড়াবার স্বাধীনতা সেদিন পায় নি। আজ সে খুঁটিয়ে দেখে নেবে সৌন্দর্যময়ী খড়কপুরকে।

খড়কপুরের লেকের সুনামে এবং এখানকার নৈসর্গিক শোভার আকর্ষণে প্রতি বছর বহু লোক ভারতের নানাপ্রান্ত থেকে আসেন। বিহার সরকারের প্রচারের কারসাজি নয়, লেকটি সত্যিই অপূর্ব। চারিদিকে পাহাড়, তার মধ্যে দিয়ে এঁকে-বেঁকে লেক এগিয়ে গেছে। পাহাড়ের চূড়াগুলোয় মেঘ জমে থাকে। শাল, সেগুন আর দেওদারের নিবিড় জঙ্গল।

ব্রিটিশ আমলে শিকারের বিশিষ্ট স্থান হিসেবে খড়কপুর চিহ্নিত ছিল। এখানকার হিংস্র জন্তুর অবিশ্বাস্য সমারোহ বিস্ময়কর। ইংরেজ রাজপুরুষেরা দল বেঁধে আসতেন বাঘ শিকার করতে। শিকারের জন্য বিশেষ কষ্ট ভোগ করতে হত না। টিন পিটিয়ে বাঘকে তাড়িয়ে আনতে হত না। ঘণ্টার পর

ঘণ্টা মাচার ওপর বসে মশার কামড় খাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠত না। বাঘ নিজেই এসে ধরা দিত বন্দুকের সীমানায়। শিকারীরা লেকের ধারের গাছ-গুলির ওপর বসে থাকতেন, বাঘেরা সপরিবারে জল খেতে আসত। তারপর প্রয়োজন হত গুটিকয়েক টাইগার বলের।

সেদিন এখন আর নেই। হিংস্র জন্তু যে কমে গেছে তা নয়—সরকারের আদেশে শিকার নিষিদ্ধ হয়েছে। খড়কপুরের জঙ্গলটি এখন সংরক্ষিত অঞ্চল। এখনকার সুন্দর ডাকবাংলোটি তৈরি হয়েছিল বোধহয় শিকারীদের সাময়িক আশ্রয়স্থল হিসেবে। এখন পিকনিক বিলাসীদের বিশ্রামকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। অবশ্য অনন্যোপায় হয়ে না পড়লে কেউ ওখানে আশ্রয় নেন না।

কাজল পায়ে পায়ে লেকের ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

আরো কয়েকটি দল এসেছে পিকনিকের উদ্দেশ্যে। লেকের পাড়ে দূরত্ব বজায় রেখে তাঁরা বসেছেন। তাস খেলছেন অনেকে। কেউ কেউ গ্রামোফোনে জনপ্রিয় হিন্দী রেকর্ড বাজাচ্ছেন। প্রাকৃতিক নির্জনতা এই কোলাহলে ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

কাজল লেকের পাড় ধরেই পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল। মনে মনে হিসেব করে দেখল, চওড়া দিকে লেকের বিস্তার চারশো গজের কম হবে না। লম্বায় এঁকে বেঁকে কতদূর গেছে কে জানে! শুনেছে জলের গভীরতা অনেক। একপাল কুমীর আছে। বদ্ধ জলাশয়ে কুমীরের উপস্থিতি বিস্ময়কর। বোধহয় কোন ইংরেজ পুঙ্গবই স্রেফ খেয়ালের ঝোঁকে গোটা তিন-চার কুমীর ছানা কোথাও থেকে এনে এখানে ফেলেছিলেন। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারা বংশবৃদ্ধি করে এখন একপালে পরিণত হয়েছে।

কাজল কয়েক পা এগিয়ে লক্ষ্য করল, কৃষ্ণারাও এসেছে। মনোরমার বান্ধবী স্নেহপ্রভার মেয়ে কৃষ্ণা। স্কুল-জীবনে কৃষ্ণা ও কাজলের মধ্যে খিটিমিটি লেগে থাকত। যে কোন উপলক্ষ্যকে নিয়ে সূত্রপাত হত কথা কাটাকাটির। কৃষ্ণা বাঙালী মেয়েদের নিয়ে একটা দল গড়েছিল। তাদের কাজ ছিল অবাঙালী মেয়েদের টিপ্পনি কেটে কথা বলা আর বিদ্রূপ করা।

এখনও মাঝে মাঝে সে সমস্ত কথা মনে পড়ে কাজলের।

টিফিনের সময় কয়েকজন একসঙ্গে চলেছে বারান্দা দিয়ে। কৃষ্ণা নিজের

দল নিয়ে উদয় হল কোথা থেকে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মত অবিশ্রান্ত মন্তব্য বর্ষণ করে চলল ওরা।

—মাগো, কি নোংরা দেখেছিস। সাতজন্মে বোধহয় চুল বাঁধে না।

—কি জট ভাই! ওদের মাথায় লাখখানেক করে উকুন নিশ্চয়ই আছে।

– নারকেল তেল বোধ হয় খুব সস্তা। কি রকম হাবড়ি-জুবড়ি করে মেখেছে দেখেছিস!

তারপর একসঙ্গে সকলের হাসি।

অগত্যা কাজলকে দল গড়তে হয়েছিল। পাটনায় কলেজে পড়তে গিয়ে দেখল তার অর্ধেক সহপাঠিণী বাঙালী। তারা অবাঙালীদের দেখে অবশ্য ঠাট্টা-বিদ্রূপের ঝড় তোলে নি। তারা অনেক মার্জিতা, রুচিশীলা। তবে অবচেতন মনের অহং মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আমার-আমার ভাবটা উৎকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে।—আমাদের রবীন্দ্রনাথ, আমাদের সুভাষচন্দ্র, আমাদের বিবেকানন্দ, আমাদের দেশবন্ধু—কমনরুমের দেওয়ালে দেওয়ালে কথাগুলো প্রতিহত হয়ে কাজলের মনে ঘা দিয়েছে। সে তিক্তমনে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছে ওদের।

খড়কপুরের অন্যতম আকর্ষণ হল লেকের জলে নৌ-বিহার। অনেকগুলো সুদৃশ্য ছোট নৌকো আছে। সামান্য কিছু পয়সার বিনিময়ে নৌকো নিয়ে জলে ভাসা যায়। কৃষ্ণারা একটা নৌকায় বসে আছে। দাঁড় টানছে কাঞ্চন। আলাপ না থাকলেও একই পাড়ায় পাশাপাশি বাড়িতে থাকার দরুন ছোটবেলা থেকেই কাঞ্চনকে দেখে আসছে কাজল। তবে দ্বিতীয় পুরুষটিকে সে চিনতে পারলো না। বোধহয় কৃষ্ণার স্বামী।

কাজল এগিয়ে চলল।

পাহাড়ের ওপর সে উঠবে। উঠে দেখবে, কতদূর দেখা যায়।

চা-পর্ব শেষ হবার পরও দীনদয়াল, জনার্দন ও ওঙ্কার সতরঞ্চিতে বসেই গল্প করছিলেন। যদিও ওঙ্কার আর দুজনের কথার সঙ্গে বেশ ভালভাবেই তাল মিলিয়ে যাচ্ছিল, তবে তার দৃষ্টি ছিল কাজলের গমন-পথের দিকে।

দীনদয়াল প্রশ্ন করলেন, নৌকোয় চড়বে জনার্দন?

—আমার ভাই নৌকোর দুলুনী ভালো লাগে না। তুমি আর ওঙ্কার

বরং একটা নৌকো নিয়ে ঘুরে এস।

ওঙ্কার বলল, নৌকোয় আমি চড়বো না। সাঁতার জানি না, জলে আবার কুমীর আছে। নৌকো ওল্টালে আর দেখতে হবে না।

—তবে আর কি! পাশার ছক বার কর জনার্দন। হয়ে যাক একহাত।

কাজল তখন বাঁকের মোড়ে পৌঁছে দৃষ্টিপথের আড়ালে চলে গেল।

ওঙ্কার বলল, উনি জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। কোন বিপদ-টিপদ হলে—

—কে, কাজল? উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে দাঁড়ালেন দীনদয়াল। দেখ দেখি কাণ্ডটা! জঙ্গলের দিকে কেন গেল বলতো? আজকালকার মেয়েদের ভয়ডব বলে কিছু নেই। বাঘে ভরা জঙ্গল। বিপদ-আপদ তো হতেই পাবে!

জনার্দন বললেন, দিনদুপুবে বাঘ বেরুবে না। তবে বুনো শুয়োরের মুখে পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

ওঙ্কার বলল, আপনারা ব্যস্ত হবেন না পিসেমশাই। আমি এখুনি ওঁকে ডেকে আনছি। ওঙ্কার দ্রুতপায়ে কাজলের সন্ধানে গেল। এরকম সুযোগ ছেড়ে দেওয়া বোকামি।

গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত স্থিব ছিল না যে, কৃষ্ণা, জয়ন্ত ও কাঞ্চন খড়্গপুব আসবে। বড়দিনের ছুটিতে কাঞ্চন বাড়ি এসেছিল। ও কলকাতার একটি সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের পদস্থ কর্মচারী। নতুন ভগ্নিপতি জয়ন্তও এসেছিল ওব সঙ্গে। খাওয়াব টেবিলে বসে স্থির হল, পরের দিন সকালে খড়্গপুর যাওয়ার কথা।

শঙ্করনাথ ব্লাডপ্রেসারের রুগী, তিনি বাড়ি ছেড়ে কোথাও যান না। কুণাল অসুস্থ থাকায় স্নেহপ্রভাও যাবেন না। খুব ভোরবেলা বাড়ির গাড়ি নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল। বেশ চওড়া পাকা রাস্তা। রাস্তাব দুপাশে ধানক্ষেত। গাড়ি ড্রাইভ করে আরাম আছে।

হঠাৎ কৃষ্ণা চেঁচিয়ে বলল, দাদা, ওই দেখ—ইস—

কাঞ্চন ও জয়ন্ত মুখ ফিরিয়ে দেখল, প্রায় শ'দেড়েক কাররা ধানক্ষেতে নামছে। তাদের অপূর্ব দেখাচ্ছে রোদ্দুরের উজ্জ্বল আলোয়। কাঞ্চন গাড়ি থামাল। গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, তোমরা গাড়িতেই বস। গোটা কয়েকের ধান খাওয়ার সাধ আমি মিটিয়ে আসছি।

কৃষ্ণা বলল, খড়কপুরে পৌঁছে পাখি মারলে হত না?

—হাতের কাছে যখন পাওয়া গেছে, অপেক্ষা করে লাভ কি? খড়কপুরে পৌঁছে যে পাখি পাওয়া যাবেই এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। মাংস আবার সঙ্গে আনা হয় নি। জয়ন্ত, তুমি কি বল?

—আপনি ঠিকই বলছেন। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে লাভ নেই।

রাস্তা থেকে দুধারের ধানক্ষেত বেশ নিচু। কাঞ্চন বন্দুক হাতে নিয়ে ধানক্ষেতে নামল। পাখিগুলো তখন ধানক্ষেতে নেমে গেছে। ও আন্দাজ করল, পাখিরা ওর কাছ থেকে হাত পঞ্চাশেক দূরে সকলরবে ধান খাচ্ছে। গুঁড়িমেরে এগিয়ে চলল কাঞ্চন। অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। মানুষের উপস্থিতির কথা জানতে পারলেই ওরা আকাশে পাখা মেলবে।

দূরত্ব কমে এল ক্রমে।

পাখিদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কাঞ্চন। নিলডাউন হয়ে ফায়ার করতে যাবে, চপচপে কাদায় পিছলে গেল। অল্প যে শব্দ হয়েছিল তাতেই সতর্ক পাখিরা খাওয়া ছেড়ে আকাশে উড়ল। শিকার হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে কাঞ্চন মরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়াল। ঝাঁক লক্ষ্য করে কয়েকবার ট্রিগার টিপল। পাখিরা খুব বেশী দূর উঠে যায় নি—এই রক্ষে।

ঝুপ ঝুপ শব্দে এখানে-ওখানে পড়ল গোটাকয়েক।

কাঞ্চন দুটো পাখি হাতে ঝুলিয়ে ফিরে এল মোটরের কাছে।

বলল, বেশ ওজন আছে।

জয়ন্ত বলল, আপনার জামা-কাপড়ে এত কাদা লাগল কিভাবে?

—আর বল কেন, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। লাক ফেবারে ছিল বলে শেষ পর্যন্ত ফায়ার করতে পারলাম।

কৃষ্ণা বলল, তুমি মাত্র দুটো নিয়ে এলে? আমি তো দেখলাম গোটাকয়েক পড়ল!

—ঠিকই দেখেছ। কোথায় পড়েছে—কাদা ঘাঁটিতে আর ইচ্ছে করল না। হাতের কাছে এ-দুটোকে পেয়ে নিয়ে এলাম। সের চারেক মাংসর কম হবে না। বলে এই আমরা খেয়ে শেষ করতে পারব না।

—সত্যি, এত মাংস কি হবে দাদা?

—কি আবার হবে, আমরা খাব!

—এত খেতে পারব?

—একবারে পারব না। যা বাঁচবে, বাড়ি নিয়ে গেলেই হবে। কাল সকাল পর্যন্ত আমরা চালাব। বুঝলে জয়ন্ত, বাসী পাখীর মাংস আর পরটা, কী যে উপাদেয় বস্তু, কি বলব! যে না খেয়েছে, তার জীবন ব্যর্থ। অবশ্য সবই নির্ভর করছে রাঁধার ওপর। কৃষ্ণা, বেশ গরগরে করে রাঁধা চাই।

লেকে স্নান করবে বলে আরেক প্রস্থ জামা-কাপড় ওরা নিয়ে এসেছিল। গাছের আড়ালে গিয়ে কাঞ্চন হাওয়াই সার্ট আর ট্রাউজার পাল্টে এল। সচল হল গাড়ি আবার। খড়কপুরে পৌঁছে প্রথম কাজ হল, পাখি দুটো ছাড়িয়ে, কেটে, একটা ডেকচিতে মশলা মেখে মাংস ঝরতে দেওয়া। করণীয় কাজগুলো সেরে, ডেকচিটা মোটরের মধ্যে রেখে—কাচ তুলে দিয়ে ওরা নৌকোয় এসে বসল।

গল্প করতে করতে ওরা জলেই ভাসছিল। হঠাৎ কৃষ্ণা বলল, দাদা, কাজলরাও এসেছে। ওই দেখ।

—জয়ন্ত, মেয়েটিকে দেখে রাখ ভাই। তোমার স্ত্রীর স্কুল-জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বিনী।

ঠোঁট উল্টে কৃষ্ণা বলল, প্রতিদ্বন্দ্বিনী না ছাই! স্কুলে কোন ব্যাপারে ও আমার সমকক্ষ ছিল না।

—কেন, লেখাপড়ায়?

—লেখাপড়ার কথা বাদ দাও। আর কোন ব্যাপারে আমার সঙ্গে পেরে উঠেছে? তবু দেমাক দেখাতে ছাড়ত না।

—যাক, ওকথা। এবার তীরে যাওয়া যাক। এখন রান্না না চড়ালে, খেতে বেশ বেলা হয়ে যাবে।

কাজল পাহাড়ের কিছুটা উঠে একটা শালগাছে ঠেসান দিয়ে হাঁপাচ্ছিল। অবশ্য চড়াইয়ের পথে কিছুদূর উঠলেই হাঁপিয়ে ওঠা স্বাভাবিক। এখান থেকে লেকটাকে দেখাচ্ছে ছবির মত। জলের ওপর কৃষ্ণাদের 'নৌকোটাকে কালো বিন্দু বলে মনে হচ্ছে। আর ওপরে উঠবে না কাজল। অত্যন্ত নির্জন চারধার। কোন বিপদ দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়।

ক্রমে হাঁপিয়ে ওঠা ভাব কেটে গেল। কাজল আঁচল দিয়ে মুখ মুছে নিচে যাওয়ার উপক্রম করতেই দেখতে পেল, ওঙ্কার উঠে আসছে। বিরক্তিতে ওর মন ভরে উঠলো।

ওঙ্কার কাছে এসে বলল, আপনার এদিকে একলা আসা ঠিক হয় নি।

কাজল কিছু না বলে নিচের দিকে নেমে চলল।

—শুনুন···

অদ্ভুত সাহস লোকটার। চলার তাল ও বজায় রাখল।

ওঙ্কার ওর পাশে এসে বলল, শুনুন····

কাজল সমস্ত শরীর শক্ত করে দাঁড়াল। —কি বলছেন ?

—আপনার সঙ্গে কথা ছিল।

—আমার সঙ্গে আপনার কোন কথা থাকতে পারে না।

—আমি জানি, আপনি আমায় চিনতে পেরেছেন। পাটনার সেই ইন্সিডেণ্টের জন্যে দুঃখিত। আপনি পারেন না আমায় ক্ষমা করতে ?

—ক্ষমা !

—আপনি ক্ষমা না করলে আমি শান্তি পাচ্ছি না।

কাজল তীক্ষ্ণগলায় বলল, ক্ষমা না পেয়ে বেশ শান্তিতে আপনার দিন কেটেছে। আমার সঙ্গে দেখা না হলে বোধহয় বাকি জীবনটাও কেটে যেত।

কথাটা শেষ করে আর দাঁড়াল না কাজল, দ্রুতপায়ে নেমে চলল। ওঙ্কার দাঁড়িয়ে রইল ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে উঠতে উঠতে চারটে বেজে গেল। এত দেরি হওয়ার কোন কারণ ছিল না। তবু দেরি হল। পাহাড়ের আড়ালে সবে

তখন সূর্যদেব মুখ লুকিয়েছেন। এখুনি সন্ধ্যা নামবে—রক্তজমাট-করা সন্ধ্যা। কন্‌কনে হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে। গতকালের চেয়ে শীত আজ বেশি পড়বে, তারই ইসারা। দুপুরে রোদ্দুর থাকায় বেশ মিষ্টি আমেজ ছিল।

দীনদয়াল আকাশের দিকে তাকালেন। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশের চারদিকে। একজোট হতে খুব বেশি সময় নেবে না। বৃষ্টি নামবেই। কোথাও হয়তো এতক্ষণে বৃষ্টি নেমেছে।

দীনদয়াল বললেন, তাড়াতাড়ি তোমরা বাঁধা-ছাঁদা সমস্ত করে নাও। বৃষ্টি এল বলে।

আকাশের যা অবস্থা তাতে এক মুহূর্ত এখানে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। মালপত্তর তাড়াতাড়ি ষ্টেশন ওয়াগনে তোলা হল। সকলে গাড়িতে গিয়ে বসলেন। ড্রাইভার তখনও সেল্‌ফ স্টার্টারে পা দেয় নি। দেখা গেল, এক দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক ওঁদের দিকে এগিয়ে আসছেন। সকলে উৎসুক দৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আগন্তুক কাছে এসে নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি এই অঞ্চলের রেঞ্জার। নাম বিনোদ শ্রীবাস্তব। তারপর বললেন, আপনাদের আজ এখান থেকে যাওয়া হবে না।

সবিস্ময়ে দীনদয়াল বললেন, কেন?

—দুটো ম্যান ইটার বেরিয়েছে।

—বলেন কি? সকলে উৎকণ্ঠায় ভেঙে পড়লেন।

—কাছাকাছি গ্রামগুলিতে কয়েকদিন ধরেই ওদের উৎপাত চলছে। এই কিছুক্ষণ আগে মুঙ্গের সড়কের ওপর ওদের দেখা গেছে। আপনাদের সাবধান করে দেওয়া আমার কর্তব্য।

কৌশল্যা ইসারায় ডাকলেন দীনদয়ালকে। বললেন, কি হবে? বাঘ বড় ভয়ানক জন্তু। আমি তখনই বলেছিলাম দিনটা ভাল কিনা পণ্ডিতজীকে একবার জিজ্ঞেস করে নাও। করলে আর এই আতান্তরে পড়তে হত না।

বিরক্তির সুরে দীনদয়াল বললেন, তুমি একটু থাম। পণ্ডিতজীর বাবার সাধ্য ছিল না, যে বলে দেয় আজ এখানে বাঘ বেরুবে!

জনার্দন তখন শ্রীবাস্তবকে প্রশ্ন করছেন, আমরা থাকব কোথায়? শীতের রাত—সঙ্গে মহিলারা রয়েছেন—

শ্রীবাস্তব বললেন, ডাকবাংলো আমি খুলিয়ে দিয়েছি। সকলকে নিয়ে সন্ধ্যা হবার আগেই চলে যান।

উপায়হীনভাবে সকলে ডাকবাংলোয় গেলেন। উপযাচক হয়ে বাঘের হাতে প্রাণ দেওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। চলন্ত ষ্টেশন ওয়াগনে বাঘ অবশ্য ঢুকতে পারবে না। তবে যেরকম দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে—প্রবল বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি যদি মাঝ পথে খারাপ হয়ে যায়, তখন? ড্রাইভার ঘাড় চুলকে জানাল, এই সম্ভাবনাকে কোন মূল্যেই হেসে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

কাঞ্চনরা আকাশের অবস্থা দেখেই গাড়ির দিকে এগোচ্ছিল। বিনোদ শ্রীবাস্তব পৌঁছলেন। তিনি পরিস্থিতি বর্ণনা করলেন। অনুরোধ করলেন ওদের ডাকবাংলোয় গিয়ে আজকের রাতটা কাটিয়ে দিতে।

বাঘ বেরিয়েছে শুনে কৃষ্ণা আঁৎকে উঠল। জয়ন্ত কলকাতার ছেলে। এই ধরনের কথা শুনতে অভ্যস্ত নয়; তার মনের মধ্যে ভয়-জড়িত অস্বোয়াস্তি দেখা দিল।

কাঞ্চন বলল, বাঘ দুটো ম্যান ইটার আপনি বুঝলেন কিভাবে?

কৃষ্ণা অস্থির গলায় বলল, এখন কি ওই সমস্ত প্রশ্ন করবার সময়? ম্যান ইটার যদি না-ই হয়, আমাদেব কাছে পেলে ছেড়ে দেবে নাকি?

—আহা. তুমি একটু থাম না।

শ্রীবাস্তব বললেন, মাসদেড়েকের মধ্যে চোদ্দজন লোককে বাঘ দুটো নিয়ে গেছে। তাছাড়া লোকালয়ের চারপাশে ওরা ঘুরে বেড়ায়। ম্যান ইটার ছাড়া আর কি বলব, বলুন?

—অসংখ্য ধন্যবাদ, মিঃ শ্রীবাস্তব। আমাদের সতর্ক করে দিয়ে ভালই কবেছেন। ডাকবাংলোয় রাত কাটাবার দরকার হবে না। আমি সত্তর মাইল স্পীডে ডেঞ্জার এরিয়াটা পার হয়ে যাব।

জয়ন্ত বলল, আমি বলছিলাম দাদা, আজকের রাতটা এখানে থেকে

যাওয়াই ভাল।

—বুঝতে পারছ না অসুবিধে হবে।

কৃষ্ণা বলল, অসুবিধে হয় হবে। শুকনো নালাটা ক্রশ করবার সময় স্পীড কমাতেই হবে। তখন যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের ওপর ? এই ধরনের মারাত্মক রিস্ক নেবার কোন মানে হয় না!

কাঞ্চন দুজনের মনের অবস্থা অনুমান করে নিয়ে আর আপত্তি করল না। ডাকবাংলোয় গিয়ে উঠল। কিন্তু এই ব্যবস্থাকে ও মেনে নিতে পারছিল না।

দক্ষিণ দিকের দুটো ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন দীনদয়ালরা।

সন্ধ্যা ঘন হয়ে উঠেছে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি আরম্ভ হল। স্থির হয়েছে, একটা ঘরে মেয়েরা থাকবেন, অন্যটায় পুরুষরা। বাইরে থেকে একটানা ঝিল্লির ঐকতান কানে আসছে। নাম না-জানা পোকারা ডেকে উঠছে থেকে থেকে। আগত রাতকে ক্রমেই ভয়াবহ মনে হচ্ছে। তাঁদের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাময় রাত।

ঝড় উঠল। বৃষ্টির বেগও বাড়ল।

সময় কাটাবার জন্যে জনার্দন গল্প আরম্ভ করলেন। বাঘের গল্প। তাদের গ্রামে একবার এক গোয়ালে বাঘ পড়েছিল। তারই গল্প। সকলে সাগ্রহে গল্প শুনছেন। কাজলের গল্পে মন নেই। বিমর্ষভাবে বসে আছে।

ওদিকে—

কাঞ্চন বলল, বাঘের ভয়ে তোমরা যে কেন এমন কাতর হয়ে পড়লে, বুঝলাম না! সমস্ত রাত এখন মশার কামড় খাও!

—বিপদকে এড়িয়ে চলাই ভাল দাদা। একটা রাত্তির না হয় কষ্ট হবে। খেতে দেব ?

—ক-টা বাজল ?

জয়ন্ত বলল, সওয়া আটটা।

—খাওয়ার পালা শেষ করে নেওয়া যেতে পারে। বেলা দুটোয় খেয়েছি। জয়ন্ত তোমার খিদে পেয়েছে ?

—খাওয়া যেতে পারে।

কৃষ্ণা তিনটে প্লেটে খাবার সাজাতে লাগল।

কাঞ্চন বলল, বিস্তর মাংস রয়েছে। দীনদয়ালবাবুদের কিছু দিয়ে এলে হয় না ?

—কাল সকালে পরটার সঙ্গে খাবে বলেছিলে যে !

—ওঁরা আটকে পড়বেন জানতেন না। খাওয়া-দাওয়ার বোধহয় এ-বেলা বিশেষ ব্যবস্থা করতে পাবেন নি। পরটা দিয়ে বাসী মাংস আরেকদিন না হয় খাওয়া যাবে।

কাঞ্চন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গল্প তখন বেশ জমে উঠেছে। দরজার গোড়ায় কেউ এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্য করে দীনদয়াল বললেন, কে—

—আমি কাঞ্চন।

সবিস্ময়ে তিনি বললেন, তুমি এখানে ?

—বেড়াতে এসেছিলাম।

—আমাদেরই মত আটকে পড়েছো ! কলকাতা থেকে এলে কবে ?

—দিন তিনেক হল। একটা কথা বলতে এসেছিলাম, আমাদের কাছে প্রচুর খাবার-দাবার রয়েছে। আপনারা আর রান্নার হাঙ্গামা করবেন না। আমি বরং—

—না, না, তার কোন দরকার নেই কাঞ্চন। দীনদয়াল বললেন, আমাদের খাওয়া-দাওয়া খুব অবেলায় হয়েছে। আর কিছুর প্রয়োজন হবে না।

—ও ! অন্য কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে জানাবেন। কয়েকখানা ঘরের পরেই আমরা আছি।

কাঞ্চন ফিরে এল নিজের ঘরে।

—ওঁদের কিছু দরকার হবে না। আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে পারি।

কৃষ্ণা প্লেটে খাবার সাজাতে সাজাতে বলল, তোমার যেমন বাড়াবাড়ি। ওরা কি আমাদের ভরসায় এখানে এসেছে নাকি?

—আমাদের ভরসায় আসবে কেন? তবে বিদেশে পরিচিত প্রতিবেশীকে সাহায্য করতে যাওয়া নিশ্চয় অন্যায় নয়?

খাওয়ার পালা শেষ হল।

ঘণ্টা দুয়েক গল্প চলল নানা বিষয় নিয়ে। অনেকগুলো সিগারেট কাঞ্চন পুড়িয়ে ছাই করে দিল। বাইরে তখন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঝরে চলেছে। বিদ্যুতের আলো ঝলকে ঝলকে ঘরে প্রবেশ করছে ভেন্টিলেটার দিয়ে। বাজ পড়ছে মাঝে মাঝে।

জয়ন্ত বলল, ক্যামেরাটা মিথ্যেই সঙ্গে আনা হল। একটা স্ন্যাপও নেওয়া হয় নি।

কৃষ্ণা বলল, সারাটা দুপুর জলে ভেসেই কেটে গেল। আমি তো তাও বলেছিলাম কয়েকবার ছবি তোলবার কথা। তুমি কানেই তুললে না!

কাঞ্চন মৃদু হেসে বলল, ছবি না তোলার জন্যে আমার ওপর স্বামী-স্ত্রীতে বেশ চটেছ মনে হচ্ছে!

—চটবার কথা কিছু নয়। তুমিই বল না, ক্যামেরাটা বয়ে আনলে কেন? বাড়িতে যেমন ওয়ার্ডরোবে রাখা ছিল—থাকত!

—দুপুরে ছবি হয় নি, এখন হবে। ফ্ল্যাসগান রয়েছে, অসুবিধের তো কিছু নেই। গোটাকয়েক স্ন্যাপ নিয়ে তোমাদের সঙ্গে ডাকবাংলোর এই ঘরটাকেও স্মরণীয় করে রাখছি! ক্যামেরাটা কোথায়?

কৃষ্ণা বলল, ক্যামেরাটা তো তোমার কাছে ছিল।

—আমার কাছে? না-না! ওই মালপত্তরের মধ্যে আছে বোধহয়।

কিন্তু খোঁজাখুঁজি করে মালপত্তরের মধ্যে ক্যামেরাটা পাওয়া গেল না।

—কোথায় গেল? গাড়িতে নেই তো?

জয়ন্ত বলল, আমার যতদূর মনে পড়ছে, আপনি যখন নৌকোর দাঁড় টানছিলেন, তখন ক্যামেরাটা পাটাতনের ওপর ছিল।

কৃষ্ণা বলল, এখন আমারও মনে পড়ছে। নৌকোতেই রয়ে গেছে ক্যামেরাটা। কি হবে?

—কি আবার হবে! গিয়ে নিয়ে আসব।

—এই বৃষ্টি মাথায় করে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে লেকের কাছে যাবে?

—যেতেই হবে। রোলিকর্ড ক্যামেরাটা এইভাবে হারিয়ে ফেলতে পারি না তো!

জয়ন্ত বলল, কিন্তু বাঘ বেরিয়েছে যে—

কাঞ্চন গ্রেট কোটটা পরে নিল।

বন্দুকটা তুলে নিয়ে বলল, এটা হাতে থাকলে ভয়ের কিছু নেই।

—দাদা, আমি বলছিলাম, এখন না গিয়ে সকালে গেলে হত না?

—সকালে গেলে ক্যামেরাটা আমি পাব না। দিনের আলো ফুটলেই যেকোন লোকের চোখে পড়ে যাবে ওটা। সে নিয়ে কেটে পড়তে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

কাঞ্চন গ্রেট কোটের কলার ভাল করে তুলে, বন্দুক হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কাজল নিজের চৌকিতে এপাশ-ওপাশ করছে।

অসংখ্য মশা যে ওর ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে, তা নয়। অজস্র চিন্তা ওকে বিনিদ্র রেখেছে। ওই সঙ্গে প্রচুর বিরক্তি। ও-ধারের বড় একটা চৌকিতে কৌশল্যা ও জনার্দনবাবুর স্ত্রী নিজের ছেলেকে নিয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছেন। আপাদমস্তক ঢেকে শুয়েছেন তাঁরা। কত নিশ্চিন্ত!

কাজল আর শুয়ে থাকতে পারল না। চৌকি ছেড়ে উঠল। ঘরের আলো জ্বলছিল। জানলার কাছে গিয়ে খড়খড়ি তুলে বাইরেটা দেখবার চেষ্টা করল। কিছুই দেখা গেল না। একঝলক কনকনে হাওয়া ঝাপটা মারল। বৃষ্টির ছাট মুখ ভিজিয়ে দিল।

খড়খড়ি বন্ধ করে কাজল আঁচল দিয়ে মুখ মুছল। এখন ক-টা বেজেছে কে জানে? চাদর গায়ে জড়িয়ে নিল কাজল। সন্তর্পণে দরজা খুলে বাইরে এল। একটানা বৃষ্টি হয়ে চলেছে। সোঁদা গন্ধে ভরে গেছে চারধার। বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দূরের অন্ধকার জঙ্গলের দিকে তাকাল কাজল।

আজকের এই নৈশ প্রকৃতির কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

হঠাৎ মৃদু শব্দে চমক ভাঙল। মুখ ফেরাতেই অসহ্য বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। ওঙ্কার এসে দাঁড়িয়েছে।

মৃদু গলায় সে বলল, একি, আপনি এখানে?

অনিচ্ছার সঙ্গে কাজল বলল, ঘুম আসছে না।

—ঘুম না আসবার মতই রাত!

কাজল কিছু বলল না। ওঙ্কার এগিয়ে এসে রেলিং ধরে দাঁড়াল।

—আমারও ঘুম এল না। তাছাড়া মশার যা উপদ্রব! ঘরে টিকতে পারলাম না। বারান্দায় এসে ভালই হল, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

কাজল ঘরের দিকে ফিরে চলল।

—চলে যাচ্ছেন? আপনাব সঙ্গে কথা ছিল যে! দুপুরে আপনি আমার কথার উত্তর দেন নি।

—কোন্ কথার?

—ওই যে পাটনার সেই ব্যাপারটার কথা বলেছিলাম!

—আপনি আমাকে এইভাবে বিরক্ত করবেন জানলে আমি এখানে আসতাম না।

—আপনাকে আমি বিরক্ত করছি না।

—করছেন বৈকি! ওই প্রসঙ্গ নিয়ে কোন কথা তুলতে আপনার কুণ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল।

ওঙ্কারের গলায় দৃঢ়তা প্রকাশ পেল।

—ছিল নাকি? আমি আপনার সঙ্গে একটা আপস করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি আমাকে উপেক্ষা করে নিজের বিপদ ডেকে আনছেন।

—বিপদ! কি বলতে চাইছেন আপনি?

—আজ পর্যন্ত আমাকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করে কেউ রেহাই পায় নি জানবেন। অর্থ ও প্রতিপত্তির জোরে মানুষকে দাবিয়ে রাখার ক্ষমতা আমি রাখি।

থর থর করে কাঁপতে লাগল কাজল।

—আপনার ধৃষ্টতা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। পথ ছাড়ুন, ঘরে যাব।

—না, পথ আমি ছাড়ব না, শোন—

ঠিক এই সময় জলের ছপ্ ছপ্ শব্দ তুলে কে একজন ওদের দিকে এগিয়ে এল। কাছে আসতে বিদ্যুতের আলোয় কাজল পরিষ্কার দেখতে পেল কাঞ্চনকে। অজস্র জল পড়ছে ওর গ্রেট কোট বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। মাথার চুলগুলো অবিন্যস্ত। একহাতে বন্দুক আরেক হাতে কি যেন।

বারান্দায় উঠে কাঞ্চন মন্থর পায়ে এগিয়ে এল।

ওকে দেখে ধড়ে প্রাণ এল তার, নিজের অবস্থার কথা ভুলে গেল কাজল। অজানতেই প্রশ্ন করল, এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলেন?

সে ভুলে গেল কাঞ্চনের সঙ্গে অতীতে তার একটা কথাও কখনও হয় নি। তার অবচেতন মন ওঙ্কারের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই হয়তো এই প্রশ্নের অবতারণা করল।

কাঞ্চন থমকে দাঁড়াল। বলল, নৌকোয় ক্যামেরাটা ফেলে এসেছিলাম। নিয়ে আসতে গিয়ে এই দুরবস্থা।

কথাটা বলেই ও আবার এগোল। কাজল চলল পিছু পিছু। ওঙ্কার দাঁড়িয়ে রইল, মনে মনে মুণ্ডপাত করতে লাগল কাঞ্চনের।

এরপর আহ্বান করা সত্ত্বেও অজুহাত দেখিয়ে কাকার বাড়ি যায় নি কাজল। শুয়ে-বসে, গল্পের বই পড়ে ওর সময় কাটতে লাগল। রেজাল্ট বেরুল যথাসময়ে। পাস করেছে ভালভাবে। মেয়েকে আর পড়াবার ইচ্ছে ছিল না হরিদয়ালের। ইচ্ছে বললে ঠিক বলা হয় না, সামর্থ ছিল না। তবু ওকে ভর্তি করে দিতে হল বি.এ.-তে। পাটনার হোষ্টেলের খরচ চালাবার জন্যে আরো গোটা কয়েক ছাত্রের গৃহশিক্ষকতা গ্রহণ করতে হল। দুটি কারণে তাঁকে এই কাজ করতে হল। প্রথম, কাজলের পড়বার প্রবল ইচ্ছে। দ্বিতীয়, দীনদয়াল এই অজুহাতে যাতে তাঁকে অর্থ সাহায্য না করে বসতে পারেন।

কলেজ খুলতেই কাজল পাটনায় গেল।

পুরোনো সহপাঠিণীরা প্রায় সকলেই পাস করেছে। তাদের মধ্যে জনপাঁচেক আর পড়বে না। তারা স্বামীর ঘর করতে চলেছে। হোষ্টেলের

অন্য ঘরে ওকে সিট দেওয়া হয়েছিল। কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে আগেকার সিটেই রয়ে গেল। কাজলের ধারণায় ঘরখানা অত্যন্ত পয়া।

নির্বিবাদেই ক্লাস করছিল। একরকম ভুলেই গিয়েছিল ওঙ্কারের কথা। বছরখানেক অতিক্রম করবার পর, একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে দেখতে পেল, হোষ্টেলের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওঙ্কার।

ওকে দেখে ওঙ্কার স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করল, কেমন আছ ?

কাজল কথার উত্তর না দিয়ে ওঙ্কারকে অতিক্রম করে ভেতরে চলে গেল।

এরপর থেকে প্রায়ই ও ওঙ্কারের চিঠি পেতে লাগল। পাতার পর পাতা প্রেমপত্র। মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে দেখা করতে লাগল। বান্ধবীরা ঠারেঠুরে ঠাট্টা যে না করল, তা নয়। কাজল অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল।

বি.এ. পাশ করে কাজল এম.এ.-তে অ্যাডমিশন নিল।

সেদিন বুধবার। কাজল হোষ্টেলে নিজের বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিল। চাকরাণী জানাল এসে, একজন দেখা করতে এসেছেন।

নিশ্চয় ওঙ্কার। তার সাহস ক্রমে গগনস্পর্শী হয়ে উঠেছে। ওর সঙ্গে দেখা করতে হোষ্টেলের মধ্যে এসেছে! আর সহ্য করা যায় না। কাজল স্থির করে ফেলল, আজ চূড়ান্ত অপমান করবে ওঙ্কারকে।

নিচে নেমে এসে দেখল, ওঙ্কার নয়, মুঙ্গের থেকে ওমপ্রকাশ এসেছে। অসময়ে দাদাকে আসতে দেখে ওর কেমন ভয় করতে লাগল। বাবার শরীর খারাপ নয়তো ? পুজোর ছুটি কাটিয়ে এখানে আসবার সময় দেখে এসেছিল, ব্লাডপ্রেসারে বেশ কষ্ট পাচ্ছিলেন তিনি।

কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল, কখন এলে দাদা ? বাড়ির সব ভাল তো ?

—মোটামুটি ভাল। বিকেলের গাড়িতেই তোমাকে আমার সঙ্গে মুঙ্গের যেতে হবে।

—মুঙ্গের! কেন ?

—তোমার বিয়ের ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে গেছে।

কাজল আকাশ থেকে পড়ল।

—বিয়ে !!!

—হ্যাঁ। এই মাসের শেষেই।

বেশ কিছুদিন ধরে গুরুজনরা ওর বিয়ের কথা চিন্তা করছেন, আন্দাজ করেছিল। তাই বলে হঠাৎ একেবারে পাকাপাকি!

—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! আমাকে না দেখেই কিভাবে পাত্রপক্ষ···

ভ্রূ কুঁচকে বিদুষী বোনের দিকে তাকাল ওমপ্রকাশ।

—ছেলের বাড়ির লোকে ছবি দেখে তোমাকে পছন্দ করেছেন। আমাদের সকলের পাত্র পছন্দ। ওরকম ঘরে বৌ হয়ে যাওয়া ভাগ্যের কথা।

কাজল আর কিছু বলল না। নিজের ঘরে গেল জিনিসপত্তর গোছাতে।

মুঙ্গেরে এসেই বুঝতে পারল পাত্রটি কে! রাগে, দুঃখে, অভিমানে ওর সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল। হাত-পা বেঁধে ওকে জলে ফেলে দিতে উদ্যত হয়েছে সকলে! সকলকে দোষ দিয়েই বা কি করবে! বড়লোকের ছেলে, চকচকে চেহারা, পেটে কিছু বিদ্যা আছে—পাত্র হিসাবে তো অতুলনীয়। মনের মধ্যেকার কদর্য রূপ তো আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না!

মনোরমার কাছে গিয়ে প্রতিবাদ জানাল কাজল।

—আমার বিয়ে অথচ আমার মতামত নেওয়ার প্রয়োজন তোমরা মনে করলে না?

শান্তগলায় মনোরমা বললেন, তোমাদের বংশে গুরুজনদের স্থির করে দেওয়া পাত্রের সঙ্গেই মেয়েদের চিরকাল বিয়ে হয়ে এসেছে।

—যাদের বিয়ে হয়েছে, তারা আমার মত স্বাধীনভাবে মানুষ হয় নি। আমাকে পড়ালে কেন? ছোটবেলায় বিয়ে দিয়ে দিলেই তো পারতে! আপদ চুকে যেত।

—এ-নিয়ে আমি তর্ক করতে চাই না কাজল। আমি জানি, তোমার বাপ-কাকা তোমাকে ভাল ঘরেই দিচ্ছেন।

কাজল ছুটে গেল কৌশল্যার কাছে।

অনুনয় করে বলল, তুমি এ-বিয়ে বন্ধ করে দাও, কাকীমা।

কৌশল্যা অবাক হল।

—কেন? কি হয়েছে?

—আমাকে ওই লোকটার হাত থেকে উদ্ধার কর।

—কার কথা বলছিস? ওঙ্কারের?

কাজল তাঁকে সবিস্তারে ওঙ্কারের ব্যবহারের কথা বলে গেল।

শেষে বলল, তুমিই বল, এরকম অসভ্য জানোয়ারের সঙ্গে…

ভাইপোর ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হলেন কৌশল্যা। আবার ওঙ্কারের সম্পর্কে ভাসুরঝির মন্তব্যগুলোও তাঁর তেমন ভাল লাগল না। লেখাপড়া শিখে কাজল বেহায়া ও বাচাল হয়ে উঠেছে, এতদিনে যেন তিনি তা বুঝতে পারলেন।

গম্ভীর গলায় বললেন, বড়লোকের ছেলেদের ওরকম স্বভাব একটু-আধটু থাকেই, বিয়ের পর আবার ঠিক হয়ে যায়। তাছাড়া তুই যতটা মনে করছিস, ওঙ্কার তত খারাপ ছেলে নয়।

আর কোন কথা বলল না। ওখান থেকে চলে এল কাজল। অরণ্যে-রোদন করে লাভ নেই। ওর মনের অবস্থাকে কেউ গ্রাহ্য করবে না।

ঊর্মিলা চিঠিগুলো পড়া শেষ করল।

কাজল বলল, দেখলি তো, একটা ভদ্রবংশের ছেলে কত নিচে নামলে কোন ভদ্রঘরের মেয়েকে ওই ভাষায় চিঠি লিখতে পারে! তুই তো আমার আদর্শের কথা জানিস ঊর্মি। আমি উদারচেতা ও সহানুভূতিশীল একজন লোকের সঙ্গে জীবন কাটাতে চাই। সে যদি অল্পবিত্তের হয়, তাতেও আমি অখুশি নই। কিন্তু ওঙ্কারের সঙ্গে সেই চরিত্রের মিল কোথায়?

—প্রত্যেক মানুষের একটা আদর্শ থাকে— ঊর্মিলা বলল, কিন্তু প্রত্যেক আদর্শের জের শেষ অবধি টানা যায় না, কাজল।

—তুই—তুইও একথা বলছিস?

—আমি তোর ভালর জন্যেই বলছি। এখন যাকে তোর ঘোর অপছন্দ, বিয়ের কিছুদিন পর দেখবি, তাকে ছেড়ে তোর একমুহূর্ত চলছে না। এইরকম হয়। আমি অনেক দেখেছি।

কাজল গুম হয়ে বসে রইল।

তিন

সুটকেস হাতে নিয়ে কাঞ্চন বাড়িতে ঢুকল।

চেঁচিয়ে ডাকল, মা—মা—

কৃষ্ণা ছুটে এল।

—দাদা, তুমি! এত দেরী হল তোমার?

—ট্রেনে এলে তো সময়মত আসব! লরিতে এলাম। রনেনদের কয়লার লরিটা খালি আসছিল। ওতেই চলে এলাম।

—তিনশো মাইল রাস্তা লরিতে এলে?

—আর বল কেন! গতর একেবারে চূর্ণ। মা কোথায়? তাঁকে দেখছি না?

টেনে টেনে কৃষ্ণা বলল, প্রাণের বন্ধু মনোরমার বাড়ি গেছেন। আজ কাজলের বিয়ে।

—তাই নাকি। কোথায় হচ্ছে?

—বোধহয় পাটনায়, আমি ঠিক জানি না।

কাঞ্চন চেঁচিয়ে চাকরকে ডাকল। চাকর আসতেই বলল, যা, হরিদয়ালবাবুর বাড়ি থেকে মাকে ডেকে নিয়ে আয়।

ও একটা চেয়ারে বসে জুতো খুলতে খুলতে বলল, একটু কষ্ট হয়েছে বটে, তবে বেশ থ্রিলিং জার্নি হল।

—তোমার বন্ধুরা কোথায়? তার করেছিলে, কারা সব আসবে তোমার সঙ্গে?

—বিশেষ কাজে আটকে পড়ল ওরা। পরে কোন সময় আসবে।

কৃষ্ণা নিজের আঁচল ঠিক করে নিতে নিতে বলল, ওর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?

—জয়ন্তর সঙ্গে? না। আমি কিছুদিন ধরে ভীষণ ব্যস্ত আছি। তার কোন খবর পাচ্ছ না নাকি?

—তা পাব না কেন? হপ্তায় একটা করে চিঠি ঠিক পাচ্ছি। ও তোমার সম্বন্ধে লিখেছিল. তাই জিজ্ঞেস করলাম।

—আমার সম্বন্ধে! আমার সম্বন্ধে আবার কি লিখল জয়ন্ত?

—হাজার হোক সে কুটুম্বর ছেলে। তোমাদের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পেতে চায়। তোমার এত সময়ের অভাব যে, ওর সঙ্গে একবার দেখা পর্যন্ত করতে পার না। অন্য কেউ হলে একথা বিশ্বাস করত, আমি করব না।

কাঞ্চন জুতোজোড়াটা একপাশে সরিয়ে রেখে শ্রান্তগলায় বলল, আট মাস পরে বাড়ি এলাম। কোথায় আমার কুশল প্রশ্ন করবে, তাড়াতাড়ি এককাপ কফি এনে দেবে, তা নয়, ঝগড়া করতে বসলে! বেশ, এবার থেকে হপ্তায় চারদিন করে জয়ন্তর সঙ্গে দেখা করব, তাহলেই খুশি তো?

—তোমরা তো আমাকে শুধু ঝগড়া করতেই দেখ!

—কি আশ্চর্য! কে বলল আমরা তোমাকে শুধু ঝগড়া করতে দেখি?

—কে আবার বলবে! তোমাদের এই মনোভাবের মূলসূত্র কোথায়, তাও আমি জানি। আমি ঝগড়াটে আর ও দয়ার পাত্র। আমরা দুজন তোমাদের মুখাপেক্ষী, তাই তোমাদের এই মনোভাব।

কাঞ্চন হতাবক হয়ে যায় কৃষ্ণার কথাবার্তা শুনে। বিচিত্র তার স্বভাব। সুযোগ পেলেই বাড়ির লোকদের দু-চার কথা শুনিয়ে দেয়। তাই বলে এতদিন পরে বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণা এত কথা বলবে, কাঞ্চন ভাবতে পারে নি।

—কি আজে-বাজে বকছো! জ্ঞানতঃ জয়ন্তর সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার আমরা করি নি। তোমাকে যতদূর সম্ভব স্বাচ্ছন্দ্য আমরা দিয়েছি। যাকগে, ও-সমস্ত কথা।

—ঝেড়ে ফেলে দেওয়া ছাড়া তোমাদের আর কিছু করবার নেই।

কুণাল এল। কাঞ্চন ছোটভাইকে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। কৃষ্ণা যা আরম্ভ করেছে, তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল অন্তত।

কাঞ্চন হাল্কা গলায় বলল, কি খবর ছোটবাবু? আজ স্কুল যাওয়া হয় নি কেন?

—আজ তো শনিবার। শনিবারে আমাদের সকালে স্কুল, ভুলে গেছ?

স্নেহপ্রভা এলেন।

—খোকা, এলি তুই? আমি ভাবলাম, তার পাওয়াই বুঝি সার হল।

কুণাল বলল, দাদা, মা তোমাকে খোকা বলেন কেন? তুমি আবার খোকা নাকি? আমাকে খোকা বললেই লোকে হাসবে।

—ছোটবাবু ঠিক বলেছে মা। এবার থেকে তুমি খোকার আগে একটা রাম জুড়ে দিও। কিম্বা ধেড়ে—

ছেলেদের সঙ্গে স্নেহপ্রভাও হাসলেন।

—হ্যাঁরে, রোগা হয়ে গেছিস কেন?

—রোগা কোথায় মা? বরং কয়েক পাউণ্ড বেড়েছি।

কাঞ্চন লম্বায় ছ' ফিটের কাছাকাছি। নাম কাঞ্চন হলেও গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম। শরীরে মাংসের বাহুল্যতা নেই। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত মুখ।

ছেলের দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকিয়ে মা বললেন, মোটা হয়েছিস না আর কিছু! তা, এলি কোন ট্রেনে?

—লরিতে। রনেনদের কয়লার লরিটা আসছিল, ওতেই চলে এলাম।

স্নেহপ্রভা আসার পরই কৃষ্ণা স্থানত্যাগ করেছিল।

—বলিস কি! এতখানি পথ লরিতে এলি! ধন্যি ছেলে বাপু! ওঁর সঙ্গে দেখা করে নিজের ঘরে যা। আমি কফি নিয়ে আসছি।

কাঞ্চন কয়েক পা এগিয়েছে, চাপাগলায় স্নেহপ্রভা বললেন, হ্যাঁরে, বাড়িতে ঢোকার সময় শুনলাম, কৃষ্ণা যেন তোকে কি বলছিল?

—নতুন কিছু নয়। ওর সেই এক প্যাটার্নের কথা, তুমি তো জান!

কাঞ্চন শঙ্করনারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

মেয়ের এই উগ্র স্বভাবের জন্যে শঙ্করনারায়ণ যে সম্পূর্ণ দায়ী, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই স্নেহপ্রভার। ছোটবেলা থেকেই কৃষ্ণার সমস্ত আব্দারকে অসম্ভব প্রশ্রয় দিয়েছেন তিনি। কতবার বলেছেন স্নেহপ্রভা, মেয়েকে এভাবে প্রশ্রয় দিও না। পরের ঘরে যাবে। এরকম আব্দারে স্বভাব···

তাঁকে কথা শেষ করতে দেন নি শঙ্করনারায়ণ। হেসে বলেছেন, দশটা নয়, পাঁচটা নয়, আমার একটা মাত্র মেয়ে। তার একটু আব্দার সহ্য করব না? কিযে বল তুমি?

কিন্তু তাঁর অনুমান মিথ্যে হয় নি। বিয়ের পর কৃষ্ণাকে নিয়ে অসম্ভব ভুগতে হচ্ছে তাঁদের। আর সকলের মত কৃষ্ণা শ্বশুরবাড়ি গেল না। একেবারেই যে গেল না, তা নয়, বিয়ের পর গিয়ে দিন সাতেক ছিল। তারপর সেই যে এসেছে, আর যায় নি। সেও এক বিচিত্র ইতিহাস।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর কৃষ্ণাকে কলকাতায় পড়তে পাঠালেন শঙ্করনারায়ণ। তিনি তখন সবে রিটায়ার করে বাড়ি এসেছেন। কৃষ্ণা কলকাতায় রইল গিয়ে হোষ্টেলে। কাঞ্চন অবশ্য তখন কলকাতাতে ছিল এবং এখনও আছে।

কি সূত্রে কৃষ্ণার সঙ্গে জয়ন্তর আলাপ হয়েছিল জানা যায় নি। একদিন ডাকে একটা চিরকুট পেয়ে ব্যাপারটা জানতে পারল কাঞ্চন। চিরকুট পাঠিয়েছিল কৃষ্ণা। কাজেই, তার কলেজ-জীবন ওখানেই শেষ হল। কাঞ্চনের মধ্যস্থতায় বিয়ে পাকাপাকি হয়ে গেল জয়ন্তর সঙ্গে।

শঙ্করনারায়ণ প্রথমে রাজি হয় নি। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরে মেয়ে দিতে তাঁর বিশেষ আপত্তি ছিল। জয়ন্তর বাবা শ' দুয়েক টাকা মাইনের চাকরি করেন। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। জয়ন্তর চাকরিটা আবার টেম্পরারি। এরকম পাত্রের হাতে তিনি কিভাবে মেয়ে দেবেন? শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন কৃষ্ণার হয়ে কাঞ্চনের বারংবার ওকালতিতে।

স্নেহপ্রভা কৃষ্ণার চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়ে ওয়াকিবহাল। প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হয়ে এবং ওই জেদি স্বভাব নিয়ে সে যে খুব বেশিদিন শ্বশুরঘর করতে পারবে না, এ বিষয় তিনি নিশ্চিত ছিলেন।

তাঁর অনুমান মিথ্যে হয় নি। বিয়ের পর দিন সাতেক শ্বশুরবাড়িতে থেকে চলে আসার পর আর ফিরে গেল না কৃষ্ণা। তবে এত তাড়াতাড়ি যে সে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবে, একথা কেউ ভাবে নি। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণার সঙ্গে জয়ন্তও তার বাপ-মা, ভাই-বোন সকলকে ছেড়ে এখানে চলে এল। স্নেহপ্রভা অবাক হয়ে ভেবেছেন, এরা মানুষ, না আর কিছু।

কাঞ্চন কয়েক মাসের মধ্যেই জয়ন্তকে ভাল একটা চাকরি সংগ্রহ করে দিল কলকাতায়। কৃষ্ণাকে একদিন সহাস্যে বলল, কোথায় তোমাদের ফ্ল্যাট দেখে দেব বল? বাগবাজারে, না বালিগঞ্জে?

ঝঙ্কার দিয়ে উঠল কৃষ্ণা।

—তোমাদের কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। ক-টাকা মাইনে পায় তোমাদের জামাই, যে কলকাতায় গিয়ে থাকব? হা-ঘরে মেয়ে দিয়ে তো আপদ বিদেয় করেছ!

কাঞ্চন বলল, সে কি! সমস্ত জেনে শুনে তুমি জয়ন্তকে বিয়ে করেছ। আমাদের অনিচ্ছাই ছিল। শুধু তোমার আগ্রহ দেখে—

—আমি যদি একটা অন্যায় আব্দার করেই থাকি—আমার ভবিষ্যতে ক্ষতি হবে বুঝতে পেরেও তোমরা মেনে নিলে কেন?

স্নেহপ্রভা ও কাঞ্চনের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হল। এরপর থেকে আর কোন বিষয়ে কখনও মেয়েকে কিছু বলেন নি স্নেহপ্রভা। কাঞ্চন তো নয়ই।

কৃষ্ণা এখানেই রয়ে গেল। জয়ন্ত ছুটিছাটাতে নিয়মিত যাওয়া-আসা করতে লাগল।

চার

পাঁচটা প্রায় বাজে।

অসম্ভব ব্যস্ততার সঙ্গে ঘোরা-ফেরা করছেন হরিদয়াল। তাঁর মনে হচ্ছে, যা তিনি করছেন না, সেই কাজটাই বুঝি হচ্ছে না। ভেতর-বাড়িতে মনোরমারও সেই এক অবস্থা। হরিদয়ালের চেয়ে অবশ্য তাঁর কাজের চাপ অনেক বেশি।

হরিদয়াল স্কুলে গিয়ে নিজেই ত্রিপল নিয়ে এসেছেন। ছাত্ররা অনেক পরিশ্রম করে সেই ত্রিপল টাঙিয়েছে ছাদে। তিনি নিশ্চিন্ত। সাতটায় লগ্ন। দীনদয়ালের বাড়ি থেকে এইমাত্র সংবাদ এল, বরকে নিয়ে বরপক্ষ শহর-পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। ঘন্টা দেড়েকের মধ্যেই বারিয়াত বাড়ির দরজার গোড়ায় এসে থামবে।

স্বরূপলাল আরো সময় চেয়েছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে বাজনা-বাদ্যি নিয়ে, বাজি পুড়িয়ে এতবড় শহর কখনও ঘোরা যায়? রাত এগারোটার পর

বর পিঁড়িতে গিয়ে বসবে, এই তো চল তাঁদের। তা নয়—

স্বরূপলাল বলেছিলেন, বাঙালীদের মত সন্ধ্যার লগ্নে বিয়ের ব্যবস্থা করলেন কেন বুঝলাম না। সময় আরো কিছু বাড়িয়ে দিন।

হাতজোড় করে হরিদয়াল বলেছিলেন, আমার স্ত্রীর বিশেষ ইচ্ছে, বিয়ে সন্ধ্যা লগ্নেই হোক। অবশ্য আপনি যদি বলেন, আমাকে মাঝরাতের লগ্নে ব্যবস্থা করতেই হবে।

স্বরূপলাল আর আপত্তি করেন নি।

বারিয়াত যখন হরিদয়ালের দরজায় এসে থামল, তখন পৌনে সাতটা। আসরে এসে বসলেন বরযাত্রীরা। জন ত্রিশেক এসেছেন। সকলেই পাটনার। বর মখমলের তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসেছে মাঝখানে। তাকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে। ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু ঘিরে রয়েছে তাকে। নিচুগলায় কথাবার্তা হচ্ছে।

নিমন্ত্রিতরাও এসে পড়েছেন। তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করলেন, কুটুম্ব করছেন বটে হরিদয়ালজী। এরকম জমজমাট বারাত বহুদিন শহরে দেখা যায় নি। টুকরো টুকরো কথা হরিদয়ালের কানে যাচ্ছে। তাঁর বুক ভরে উঠছে। সবই মেয়ের ভাগ্য, তিনি তো নিমিত্ত মাত্র।

কনে সাজান শেষ করেছিল ঊর্মিলা।

সুসজ্জিতা কাজল বসেছিল গম্ভীর মুখে।

ঊর্মিলা বলল, প্রত্যেক জিনিসের কিন্তু সীমা আছে, কাজল! এখনও এত মনমরা হয়ে থাকার কোন অর্থ হয়?

—আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না, ঊর্মি।

—ভাল না লাগলে তো চলবে না। মন শক্ত কর। ভুলে যাস না, ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে সারাটা জীবন তোকে মানিয়ে চলতে হবে।

কাজল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

ঊর্মিলা বলল, ওসব কথা আর ভাবিস না। আয়নার দিকে একবার চেয়ে দেখ। কত সুন্দর লাগছে তোকে। চেয়ে দেখ একবার!

এই সময় কোলাহল কানে এল, বর আসছে—বর আসছে—

—ওমা, বর এসে পড়ল! তুই বস, আমি তোর বর দেখে আসি।

ঊর্মিলা ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

ওদিকে স্বরূপলাল হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে তখন বলছেন, আর তো বেশী সময় নেই দীনদয়াল—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়—, দীনদয়াল তাড়াতাড়ি বললেন, আমি এখুনি পুরোহিতজীর অনুমতি নিয়ে আসছি।

তিনি দ্রুতপায়ে ভেতরে চলে গেলেন।

মাড়োয়ার পাশে উবু হয়ে দুপক্ষের পুরোহিত বসেছিলেন। পাত্রপক্ষের পুরোহিত রাজধানী থেকে এসেছেন। তাঁর চাল-চলন এবং বোলচাল আলাদা ধরনের। তিনি কন্যাপক্ষের পুরোহিতকে নিজের শাস্ত্রের ওপর অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা সালঙ্কারে বলছিলেন।

দীনদয়াল এসে রসভঙ্গ করলেন।

—সময় হয়ে গেছে, এবার অনুষ্ঠান আরম্ভ করা যেতে পারে কি ?

পাত্রপক্ষের পুরোহিত বললেন, পারে বৈকি। নির্ধারিত লগ্নে বিয়ে আরম্ভ করাই হল শাস্ত্র সম্মত। ওঁদের নিয়ে আসুন।

স্বরূপলালের অনুমতি নিয়ে ওঙ্কারকে বিবাহমণ্ডপে আনা হল।

প্রাথমিক অনুষ্ঠানের পর পাত্রীকে আনতে বললেন পুরোহিতরা। হরিদয়াল ছুটলেন মেয়েকে আনতে। মনোরমাও তাঁকে অনুসরণ করলেন। দুজনে কাজলের ঘরে গিয়ে দেখলেন, ঘরে কেউ নেই।

কোথায় গেল কাজল ?

পাশের ঘরে তাঁরা দেখলেন। সেখানেও নেই। বাথরুমও খালি। কোথায় গেল মেয়েটা ? দুজনের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। মনোরমা ছুটলেন ঊর্মিলার কাছে। ঊর্মিলা তখন ওঙ্কারের মাথায় খৈ ছড়াচ্ছিল।

তাকে একপাশে ডেকে এনে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁরে, কাজল কোথায় ?

—কেন, নিজের ঘরে ?

—ঘরে নেই।

—তাহলে বোধহয় বাথরুমে, কি অন্য কোন ঘরে গেছে।

—চল তো মা, আমি তাকে কোথাও দেখতে পেলাম না।

ভয়চকিত মনে ঊর্মিলা মনোরমাকে অনুসরণ করল। সারা বাড়ি খুঁজেও কিন্তু পাওয়া গেল না কাজলকে। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন হরিদয়াল। তাঁর চোখের সামনে অন্ধকারের পুরু পর্দা নেমে এল। এখন তিনি কি বলবেন পাত্রপক্ষকে?

মনোরমা পাথর হয়ে গেছেন। এই বিয়েতে তার আপত্তি ছিল, তাই বলে তার মত শিক্ষিতা মেয়ে বাড়ি থেকে চলে যাবে স্বপ্নেও যে ভাবা যায় না! বুড়ো অসহায় বাপের মুখের দিকে একবার তাকাল না সে! একটু চিন্তা করে দেখল না, এইভাবে চলে গেলে সমাজের কাছে তাঁরা কোন কৈফিয়ৎ উপস্থিত করতে পারবেন না।

স্নেহপ্রভাও স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। মনোরমাকে সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা তাঁর নেই।

ঊর্মিলাও কি ভাবতে পেরেছিল, তার চোখেও এইভাবে ধুলো দেবে কাজল?

মণ্ডপে মেয়েকে আনতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে অধৈর্য গলায় স্বরূপলাল বললেন, এত দেরী হচ্ছে কেন? দীনদয়াল, দেখ কি হল?

আসল ব্যাপার দীনদয়াল জানতে পেরেছিলেন। তিনি আমতা আমতা করতে লাগলেন। কথাটা চাপা থাকে নি। এ-কান সে-কান হতে হতে বেশ রাষ্ট হয়ে পড়েছিল। বরযাত্রীরা শুনলেন। তাঁদের মধ্যে একজন স্বরূপলালের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কথাটা জানালেন।

পেট্রোলে দেশলাইয়ের কাঠি পড়ল যেন।

স্বরূপলাল চীৎকার করে উঠলেন, দীনদয়াল....

চীৎকার করবার প্রয়োজন ছিল না। দীনদয়াল কাছেই ছিলেন।

—এসব কি শুনছি?

দীনদয়াল ইতস্তত করে বললেন, আমিও শুনছি, আমার ভাইঝিকে পাওয়া যাচ্ছে না।

—পালিয়ে গেছে বলতে এখনও মুখে আটকাচ্ছে?

ফেটে পড়লেন স্বরূপলাল।

—ছি ছি ছি দীনদয়াল, তুমি এইভাবে আমাকে অপমান করবে, কল্পনাও

করতে পারি নি।

—আমি অপমান করি নি। পরিস্থিতি এরকম দাঁড়িয়েছে যে ··

—আর পবিস্থিতির দোহাই দিতে হবে না। আমার আহম্মক ছেলে না হয় বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তুমি কি বলে তোমাব বদস্বভাবের ভাইঝিকে আমার ঘরে বৌ করে পাঠাচ্ছিলে? আমাকে এইভাবে অপমান করা? বারিয়াত এনে ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে হবে? ডাক তোমার ওই জোচ্চোব দাদাটিকে। জানে না বোধ হয় কাকে সে টেক্কা দিতে গেছে?

কাঁপতে কাঁপতে হরিদয়াল এলেন।

করজোড়ে বললেন, আপনাকে বলবার আমার কিছু নেই। মেয়েটা আমার মান-সম্মান সমস্ত ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে গেছে।

—ওসব ছেঁদো কথা আমায় শোনাতে হবে না। এদিকে আমার সম্মান যে ধুলোয় মিশেছে, তার কি হবে?

—এখন আমায় কি করতে বলেন? আমার সাধ্যের মধ্যে যা কুলোবে আমি তা করব।

গালাগালির ছড়া কাটতে আরম্ভ করলেন স্বরূপলাল। চতুর্বেদীদের কয়েক পুরুষকে নরকস্থ করতে করতে রক্তবর্ণ হয়ে উঠল তাঁর মুখ। তাঁকে আর কিছুতেই নিরস্ত করা যায় না। শেষে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের বারংবার অনুরোধে তিনি একটু ঠাণ্ডা হলেন।

বললেন, কিন্তু ছেলেব বিয়ে না দিয়ে আমি মুঙ্গের থেকে নড়ব না। বৌ না নিয়ে পাটনায় গেলে সমাজে কি আর আমার মান থাকবে?

কোনবকমে হরিদয়াল বললেন, আমার তো আর মেয়ে নেই!

—থাকলেই বা ঘরে নিচ্ছে কে? একটিব চরিত্রের যে পরিচয় পেলাম···। যেখান থেকে হোক ভদ্র একটি মেয়ে আমাকে জোগাড় করে দিতেই হবে।

স্বরূপলালের কথাকে সকলে সমর্থন জানালেন। উপযুক্ত প্রস্তাব। এখন একটি মেয়ে পাওয়া গেলেই হয়। হরিদয়াল ইতি-উতি করতে লাগলেন। সমস্যা'র সমাধান করলেন দীনদয়াল।

বললেন, আমার সন্ধানে একটি ভাল মেয়ে আছে। আমার বন্ধু

জনার্দনের ভাগ্নী। যদি বলেন তো দেখি।

—বলাবলির কি আছে, দেখ…

দীনদয়াল ছুটলেন।

বাজি হলেন জনার্দন। রাগে ফুলতে ফুলতে আশাহত ওঙ্কারকে নিয়ে স্বরূপলাল জনার্দনের বাড়ি চলে গেলেন। নিমন্ত্রিতরাও একে একে বিদায় নিলেন। দু-চারজন রইলেন শুধু মজা দেখবার জন্যে।

স্কুলের সেক্রেটারী যাবার সময় বলে গেলেন, আপনি যেভাবে মেয়েকে শিক্ষা দিয়েছেন দেখলাম, এরপর আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে স্কুলের ছাত্রদের শিক্ষার ভার আর আপনাকে দেওয়া যায় কি না।

হরিদয়াল বুঝলেন, তাঁর স্কুলের চাকরিটি গেল।

সাড়ে ছ-টা বেজে গিয়েছিল। শীতের সন্ধ্যা।

কাঞ্চন সিগারেট ধরিয়ে বাগানের বাঁধানো চত্বরের ওপর এসে দাঁড়াল।

চত্বরের সামনেই ফুলবাগান। শঙ্করনারায়ণ কাজ থেকে অবসর নিয়ে বাড়ি এসে দুটো জিনিষ নিয়ে মেতে আছেন। ওয়েষ্টার্ন নভেল আর ফুলবাগান। কত জায়গা থেকে যে ফুলের চারা আর ডাল আনাচ্ছেন, তার ইয়ত্তা নেই। প্রত্যেকদিন সকালে খুরপি হাতে নিয়ে বাগানে কাটান ঘণ্টা দুয়েক। যে কোন ঋতুতেই কাঞ্চন বাড়ি আসুক না কেন, সন্ধ্যার সময় ঘণ্টাখানেক এই চত্বরে এসে পায়চারি করে। ফুলবাগানের একধার থেকে হরিদয়ালবাবুর বাড়ি আরম্ভ হয়েছে। অন্যধারে খেত। খেত-ভর্তি বেগুন গাছ দেখতে পেল কাঞ্চন।

সানাইয়ের সুর ভেসে আসছে। হরিদয়ালবাবুর মেয়ের বিয়ে। সানাইয়ের সুরে কেমন একটা মাদকতা থাকে। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কাঞ্চন সুরের মায়ায় তন্ময় হয়ে উঠল।

হঠাৎ একসময় থেমে গেল সানাই। রাগের সমাপ্তিতে নয়—আচমকা।

তাছাড়া কেমন যেন গোলমালের শব্দ আসতে লাগল। কাঞ্চন ও নিয়ে মাথা ঘামাল না। বিয়েবাড়িতে হৈ-হল্লা হবে, এ আর বিচিত্র কি! ও

চত্বরের অন্য পাশে গিয়ে ভালভাবে বেগুন গাছগুলো দেখতে লাগল। বেশ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছ হয়েছে। বেগুনও ফলছে বোধহয় ভাল।

সিগারেট নিভে গিয়েছিল। টুকরোটা ফেলে দিয়ে বাড়ির ভেতরে যাবার জন্যে পা বাড়াল কাঞ্চন।···ওকি, টগর গাছটা এত নড়ছে কেন? নড়বার তো কথা নয়! কেউ ওখানে দাঁড়িয়ে আছে নাকি?

কয়েক পা এগিয়ে কাঞ্চন বলল, কে....কে ওখানে?

গাছের পাশ থেকে বেরিয়ে এল একজন। আবছা অন্ধকারের মধ্যেও বুঝতে পারা গেল, সে আর কেউ নয়, কাজল!

—একি, আপনি!

কাঞ্চনের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না ও! যার এই সন্ধ্যালগ্নে বিয়ে হওয়ার কথা, সে এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিল?

কাঁপাগলায় কাজল বলল, ক'টা বেজেছে আপনার ঘড়িতে?

কাঞ্চন রেডিয়াম ডায়ালযুক্ত রিষ্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে বলল, সাতটা কুড়ি।

কাজল সময় জেনে নিয়ে আবার টগর গাছটার দিকে এগিয়ে গেল। গাছটার পরই মর্নিং গ্লোরির বেড়া। বেড়ার ওধারে হরিদয়ালবাবুর বাড়ি।

—দাঁড়ান···

কাজল দাঁড়াল।

কাঞ্চন তার কাছে গিয়ে বলল, কি হয়েছে বলুন তো? অবশ্য অনধিকার চর্চা হচ্ছে····

নতমুখে কাজল বলল, লগ্নের সময়টা উৎরে দেবার জন্যে আমি এখানে অপেক্ষা করছিলাম।

—সে কী!

কাজল নীরব রইল।

—কেন একাজ করলেন?

—না করে আমার উপায় ছিল না।

কাঞ্চন আরো এগিয়ে গেল।

—আপনি নিজের বিয়েতে কেন এমন গোলমালের সৃষ্টি করলেন জানি না। কিন্তু এর পরের পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে দেখেছেন কি ?

—পরের পরিস্থিতি !

—এতক্ষণে আপনার বাবা চূড়ান্ত অপমানেব মুখোমুখি হযেছেন। এরপর আপনাদের সমাজে আপনাদের হেয় জ্ঞান করবে. চিন্তা করে দেখেন নি বোধহয় ?

ঝোঁকের মাথায় বাড়ি থেকে চলে আসার পবই কাজল বুঝতে পেবেছিল, কাজটা খুব গর্হিত হয়ে গেছে। এখন কাঞ্চনেব কথায় গুরুত্ব আরো বেড়ে গেল। আসলে সে চেয়েছিল কোনরকমে বিয়েটা ভেঙে দিতে। পাত্রপক্ষ চলে গেলেই আবার বাড়ি ফিরে যেত। কিন্তু···

অসহায়ভাবে অন্ধকারের মধ্যেই কাঞ্চনের দিকে তাকাল কাজল। এদিকটা একেবারেই ভেবে দেখে নি সে। তাদের সমাজে অনেক নিয়ম এখনও আগেকার মত আছে। ক্ষমা বা উদারতা কেউ প্রকাশ করতে গেলেও ধিকৃত হয়। এক-ঘরে হয়ে থাকার মত অভিশাপ আর নেই।

কাজলের বাড়ি ফেরার উৎসাহ নিভে গেল।

অসংলগ্ন গলায় বলল, কি হবে ?

—কি হবে বলা দুষ্কর। অবস্থা আপনি খুবই ঘোরাল করে তুলেছেন।

কাজলের দুচোখ ঝাপসা হয়ে উঠল।

—আমি·········আমি কিন্তু······

কাঞ্চন একটু চিন্তা করে বলল, আসুন আপনি আমার সঙ্গে। মাকে আপনাদের ওখান থেকে ডেকে পাঠাচ্ছি। তিনি বরং আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। আসুন····

কাঞ্চন এগোল।

অনন্যোপায় হয়ে ওকে অনুসরণ করল

বিয়ে বাড়িতে আর কোন জেল্লা নেই।

মনোরমার সাধের সানাই বাজছে না। চারিদিকে থমথমে ভাব। অনেক

কিছু পড়ে আছে এখানে-ওখানে। যেন ভাঙা হাট। এতক্ষণে বোধহয় জনার্দনের ভাগ্নীর সঙ্গে ওঙ্কারের বিয়ে আরম্ভ হয়ে গেছে।

মাথা তুলতে পারছেন না হরিদয়াল। অসংখ্য লোকের পদদলিত ফরাসের ওপর মুহ্যমান অবস্থায় বসে আছেন তিনি। আজকের এই হেঁট মাথা জীবনে আর তুলতে পারবেন না। সমাজের একপাশে সকলের উপেক্ষার পাত্র হয়ে পড়ে থাকতে হবে তাঁদের। কালকের এই সময় নিশ্চিন্ত মনে অনুষ্ঠানের আয়োজনে ব্যস্ত আছেন, আর আজ—ভাগ্যের কি বিচিত্র পরিহাস!

অন্দরমহলে মনোরমা কাঁদছেন।

চরম দুঃখের দিনেও যাঁর মুখে হাসি লেগে থাকত, সেই মনোরমা কাঁদছেন। কাঁদছেন কাজলের এই কেলেঙ্কারীর জন্যে নয়। তিনি কাঁদছেন হরিদয়ালের কথা ভেবে। যে মানুষ শত অভাব-অভিযোগের মধ্যেও সত্যের পথ ধরে মাথা উঁচু করে এতদিন এগিয়ে এসেছেন, কাল থেকে তাঁর জীবন-যাত্রার কত পরিবর্তন হবে। কেউ ভালভাবে কথা বলবে না, কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে আহ্বান আসবে না, এমন কি বিপদ-আপদেও কেউ ডাকবে না।

স্নেহপ্রভাও আছেন ওখানে। মূক দর্শক হয়ে বান্ধবীর পাশে বসে আছেন। আরো অনেকে আছেন, আছেন পাড়ার মেয়েরা। যাঁদের বহু পূর্বেই চলে যাওয়া উচিত ছিল, যান নি শেষ পর্যন্ত জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় দেখবার জন্যে। তাঁদের কথাবার্তার মৃদু গুঞ্জন চলেছে।

ওমপ্রকাশ এতক্ষণ এখানেই ছিল।

মেয়েদের কলেজে পড়ানোর কুফল সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ ভাষায় মাকে অনেক কথা বলছিল। কাটা ঘায়ে এই নুনের ছিটে দেওয়া কেন, স্নেহপ্রভা মোটেই বুঝতে পারেন নি। কাজলের কোন কিছুর জন্যেই তো মনোরমা দায়ী নন। তাঁর ওপর মনের ঝাল ঝেড়ে এই বিপদের সময় তো কোন লাভ হবে না।

জনার্দনের ভাগ্নীর সঙ্গে ওঙ্কারের বিয়ে স্থির হতেই কৌশল্যা সেখানে চলে গেছেন। হাজার হোক তাঁর ভাইপোর বিয়ে। দীনদয়ালও গেছেন।

পাড়ার যে সমস্ত মহিলারা বসে গুলতানি করছিলেন, এতক্ষণ পরে তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, কেঁদে আর কি করবে? চারদিকে খোঁজ-খবর নাও, দেখ, কোথায় গেল মেয়েটা। জলে ডুবল কিনা কে জানে!

—তোমার যেমন কথা পান্নার মা ! বললেন আরেকজন, জলে ডুবে মরতে যাবে কোন দুঃখে বল তো ? ওমপ্রকাশ যা বলে গেল, ওই হল আসল কথা। দু-পাতা বিদ্যে পড়েছে পেটে, তারপর কলেজের হালচাল তো জানই !

—কারুর সঙ্গে মজেছিল, তারই সঙ্গে সরে পড়েছে ? হতে পারে…

—হতে পারে কি, তাই হয়েছে। কি ঘেন্নার কথা ভাই !

আরেকজন বললেন, আমার মেয়ে দুটোকে তাই'তো কলেজে পড়তে দিলুম না। কোন্ দিন ছোঁড়াদের পাল্লায় পড়ে যাবে। আমার মেয়েরা যদিও তেমন নয়। তবু সাবধান হতে দোষ নেই। আমি বলি কি ওমের মা, পুলিশে খবর দাও। পুলিশ খুঁজে-পেতে ছোঁড়া ছুঁড়ি দুটোকে ধরে নিয়ে আসুক।

মনোরমা কিছু বললেন না। কি বলবেন ?

স্নেহপ্রভা অসহ্য বিরক্তি নিয়ে বসে রইলেন।

—কিরকম দিনকাল পড়েছে দেখ। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যার বাপ সংসার চালায়, তার কি এই সমস্ত করা সাজে ?

—সাজা-সাজির কি আছে ভাই ! যারা বেহায়ামো করব স্থির করে ফেলে, তারা এত কথা ভাবে নাকি ? আমার তো পরিষ্কার কথা, বিয়ের ব্যবস্থা হবার আগে সরে পড়লেই তো হত ! একরাশ টাকা নষ্ট হত না তাহলে।

—এত লোকও হাসত না।

—আহা হা, ওমের মাকে দেখলে কষ্ট হয় !

স্নেহপ্রভা আর স্থির থাকতে পারলেন না।

বেশ তীব্রগলায় বললেন, ও-বেচারী নিজের জ্বালায় জ্বলছে। আপনারা কেন আর ওই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বাড়াচ্ছেন ?

কেউ আর কিছু বললেন না। গা টেপাটিপি করলেন নিজেদের।

এই সময় চাকর গিয়ে জানাল, দাদাবাবু স্নেহপ্রভাকে ডাকছেন।

কাজলের নাটকীয়ভাবে 'আগমনের সংবাদ কাঞ্চন কৃষ্ণাকে দেয় নি। আরেক বিশ্রী পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে অনুমান করেই সংবাদ দেয় নি। মা এসে পড়লেই চুপচাপ কাজলকে ও-বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়াই কাঞ্চনের উদ্দেশ্য।

ভদ্রমহিলা দুর্বিপাকে পড়েছেন, এটুকু অন্তত না করলে মনুষ্যত্ববোধের সঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না।

স্নেহপ্রভা দরজার সামনে কাঞ্চনকে দেখতে পেলেন।

—কিরে খোকা?

—আমার ঘরে এস মা।

ছেলের কথা বলার ভঙ্গিতে একটু অবাক হলেন। কাঞ্চন এগিয়ে গিয়েছিল। ওকে অনুসরণ করে ওর ঘরে গেলেন। ঘরে পা দিয়েই আশ্চর্য হলেন স্নেহপ্রভা। একধারে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাজল। বধূবেশী কাজল।

বিস্মিত মনকে দ্রুত সংযত করলেন স্নেহপ্রভা।

ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, খোকা, তুই ঘরের বাইরে যা।

কাঞ্চন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ঘর থেকে স্নেহপ্রভা প্রায় পনের মিনিট পরে বেরুলেন।

কাঞ্চন বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওর কাছে গিয়ে তিনি শান্ত গলায় বললেন, আমার একটা কথা রাখবি খোকা?

—কি কথা মা?

—আগে বল, রাখবি।

—আজ পর্যন্ত তোমার কোন্ কথাটা না রেখেছি বল?

—ঠিক রাখবি তো?

—কি আশ্চর্য, তুমি বলেই দেখ না।

—তুই কাজলকে বিয়ে কর।

এই আকস্মিক প্রশ্নে কাঞ্চন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

—মা!

স্নেহপ্রভা ওর হাত চেপে ধরলেন।

—আপত্তি করিস না বাবা!

—মা, তুমি কি বলছ?

—ওর বাপ-মাকে সমাজের নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচা খোকা। মেয়েটাকে নতুন জীবন তুই ছাড়া আর কেউ দিতে পারবে না।

কাঞ্চন কেমন অসহায় বোধ করতে থাকে। ও ভাবতে পারে নি,

চতুর্বেদীদের বাড়ির বিপর্যয়ের ঢেউ ওকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

—আমাকে একটু ভাবতে দাও, মা।

—ভাববার সময় নেই। তুই রাজি হয়ে যা বাবা!

—তুমি একটু ভেবে দেখ মা, একটা অবাঙালী মেয়েকে বৌ হিসেবে তুমি মেনে নিতে চলেছো। এর পরিণাম সুদূরপ্রসারী হতে পারে।

মরিয়া হয়ে উঠেছেন স্নেহপ্রভা। মনোরমাকে তিনি বাঁচাবেন। হরিদয়ালকে আবার ফিরিয়ে দেবেন তাঁর পূর্ব-সম্মান।

গলায় জোর দিয়ে বললেন, পরিণামে ভালই হবে। খোকা, তুই ভেবে দেখ, মেয়েটার কলঙ্ক রটে গেছে, ওর আর বিয়ে হবে না।

—কিন্তু....

—কোন কিন্তু নয়। তাছাড়া রূপে, গুণে, শিক্ষায় কাজলের মত মেয়ে লাখে একটা পাওয়া যায়। হলেই বা অবাঙালী, আমি বলছি, তোর কোন অসুবিধে হবে না।

কাঞ্চন গুম্ হয়ে বসে রইল কয়েক মিনিট।

তারপর সমস্ত ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে বলল, বেশ, তোমার কোন কথা আজ পর্যন্ত অমান্য করি নি, এটাও করব না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন স্নেহপ্রভা।

—তুই বেঁচে থাক বাবা! সুখী হ!

একটা বাধাকে অতিক্রম করে দ্বিতীয় বাধার সম্মুখীন হতে চললেন স্নেহপ্রভা। বিয়েবাড়িতে যাবার জন্যে শঙ্করনারায়ণ তখন নিজের সাজ-পোষাক করছিলেন। স্ত্রীকে এই সময় আসতে দেখে একটু অবাক হলেন। কারণ, তাঁর এখন বিয়েবাড়িতে বিশেষ ব্যস্ত থাকবার কথা।

—কিগো, তুমি চলে এলে এখন?

—এলাম বিশেষ একটা কথা বলতে।

মৃদু হেসে শঙ্করনারায়ণ বললেন, যৌতুকটা সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে তো? মনে আছে, তুমি আমাকে যতটা ভুলো মনে কর, আমি ততটা নই। বিয়ে

আরম্ভ হয়ে গেছে নিশ্চয় ?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্নেহপ্রভা বললেন, বিয়ে ভণ্ডুল হয়ে গেছে।

—কি বলছো তুমি!

—ওঁরা ছেলে তুলে নিয়ে চলে গেছেন। এতক্ষণে অন্যত্র সেই ছেলের বিয়ে বোধহয় আরম্ভ হয়ে গেছে।

—কেন....এরকম হবার কারণ কি ?

স্নেহপ্রভা একে একে সমস্ত কিছু বর্ণনা করলেন। কাজল এ-বাড়িতেই উপস্থিত আছে সেকথাও বললেন। সমস্ত শুনে শঙ্করনারায়ণ অত্যন্ত মর্মাহত হলেন।

বললেন, এখন উপায়! তুমি বলছো পাত্রটির অন্য কোথাও বিয়ে হচ্ছে। হরিদয়ালবাবু সত্যি খুব বিপাকে পড়েছেন।

—তাঁর মত মানুষ এরকম বিপদে পড়বেন কে ভেবেছিল ?

—এখন অন্য কোন পাত্র পাওয়া দুষ্কর। কখন যে কোথা থেকে মানুষের বিপদ এসে পড়বে, কেউ বলতে পারে না।

স্নেহপ্রভা আসল কথায় এলেন এবার।

বললেন, এই বিপদ থেকে এখন আমরাই একমাত্র হরিদয়ালবাবুকে রক্ষা করতে পারি।

—আমরা!

—হ্যাঁ।

—আমরা তাঁকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি, প্রভা ?

—মেয়েটিকে ঘরে নিয়ে।

বিস্মিত শঙ্করনারায়ণ বললেন, কি বলছো তুমি! মেয়েটিকে ঘরে নেব ?

—দোষ কি ?

—না-না, এ অসম্ভব। যা কখনও হয় নি, একটা অবাঙালী মেয়েকে···

—কখনও হয় নি বলে কখনও হবে না, এরকম কি কোন বাধ্যবাধকতা আছে ? তুমি আপত্তি করো না। ভেবে দেখ হরিদয়ালবাবুর কথা। ওই দুঃস্থ মানুষটির বাকি জীবন কত শোচনীয়ভাবে কাটবে!

—কিন্তু কাঞ্চন ? তারও তো একটা মতামত আছে ? সে এখন আর

ছেলেমানুষ নেই।

—আমি তাকে রাজি করিয়েছি।

শঙ্করনারায়ণ স্ত্রীর কাছে এগিয়ে এসে বললেন, সংসারের কোন ব্যাপারে আজ পর্যন্ত মাথা গলাইনি। তোমার ওপরই নির্ভর করেছি। তুমি যা করেছো ভালই হয়েছে। তোমার যখন এত ইচ্ছে, আমি আর অমত করব না।

পাঁজি দেখা হল। এগারোটা তেতাল্লিশে একটা লগ্ন আছে। এখন আটটা কুড়ি।

স্নেহপ্রভা বললেন, তুমি তাহলে হরিদয়ালবাবুর কাছে যাও। আমি কাজলকে সঙ্গে নিয়ে ও-বাড়ি যাচ্ছি।

পাঁচ

স্নেহপ্রভা কাজলকে সঙ্গে নিয়ে ও-বাড়িতে গেলেন।

তখনও পদদলিত ফরাসের ওপর মাথা নিচু করে হরিদয়াল বসে আছেন। পাথর কেটে তৈরি মূর্তির মত মনে হচ্ছে তাঁকে। তাঁকে অতিক্রম করে অন্দরমহলে প্রবেশ করলেন স্নেহপ্রভা। কাজলকে ফিরে আসতে দেখে সমবেত মহিলাদের দুচোখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠল। মনোরমাও বিস্ফারিত চোখে তাকালেন।

তারপর তীক্ষ্ণগলায় বললেন, কোথায় ছিল ও? বংশের মুখে চুনকালি লাগিয়ে কোথায় গিয়ে বসে ছিল?

—কাজল, তুমি নিজের ঘরে যাও।

মনোরমার দিকে তাকিয়ে স্নেহপ্রভা বললেন, এদিকে আয়। কথা আছে।

বারান্দার অপর প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালেন দুজনে।

—কোথায় ছিল ও?

—আমার বাড়িতে।

—তোর বাড়িতে? ওকে ফিরিয়ে আনলি কেন? ওর পোড়া মুখ

দেখতেও যে আমার ঘেন্না করছে! গঙ্গায় গিয়ে ডুবে মরতে পারল না?

—আমার কথা শোন....

—ওর জন্যে আমার কাছে ওকালতি করিস না ভাই। জন্মে অবধি আমাকে জ্বালাচ্ছে। কি কাণ্ডটা করল বলতো! চারদিকে ঢি-ঢি পড়ে গেছে। মুঙ্গেরের বাসই হয়তো আমাদের তুলে দিতে হবে।

স্নেহপ্রভা নরম গলায় বললেন, তুই একটু ধৈর্য ধরে আমার কথা শোন। সমস্ত দিক রক্ষা পাবে। তোদের মনোনীত পাত্র কাজলের পছন্দ হয় নি, তাই ও এতক্ষণ আমার বাড়িতে লুকিয়ে ছিল। যাক, যা হবার হয়ে গেছে। এখন অন্য একটা পাত্রের সঙ্গে কাজলের বিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

—দেওয়া যেতে পারলেও কে ওকে বিয়ে করবে? তাছাড়া ওই কেলেঙ্কারীর পর কারুর কাছে গিয়ে অনুরোধ জানাবার মুখ আমাদের নেই।

—আমি দেব পাত্রের সন্ধান।

—তুই! তুই দিবি?

—হ্যাঁ। পাত্র তোর অপছন্দ হবে না। তুই তাকে যথেষ্ট স্নেহ করিস।

—কে? কার কথা বলছিস?

—খোকার কথা বলছি।

—খোকা! নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেন না মনোরমা। কি বলছিস তুই? খোকা কাজলকে বিয়ে করবে?

—কেন, খোকাকে তোর পছন্দ হচ্ছে না?

অজস্র জল মনোরমার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

তিনি জড়িয়ে ধরলেন স্নেহপ্রভাকে।

—পছন্দ! তুই আমাকে বাঁচালি...তুই আমাদের বাঁচালি। তোর এই ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না।

—ঋণ বলছিস কেন? আমার যা করা উচিত, আমি তাই করেছি। যাক, তোর মত পাওয়া গেল। এখন হরিদয়ালবাবু বাঙালী জামাই করতে রাজি হলে হয়!

মনোরমা কিছু বলতে যাবার আগেই হরিদয়াল ও শঙ্করনারায়ণ এসে পড়লেন। দুজনে মাথার কাপড় টেনে দিলেন একটু করে। স্নেহপ্রভার

শেষ কথা হরিদয়ালের কানে গিয়েছিল।

তিনি বললেন, বেহারী বৌকে ঘরে নিতে আপনার যদি আপত্তি না থাকে, এমন উপযুক্ত ছেলেকে জামাই করতে আমার আপত্তি হবে কেন? হলেই বা বাঙালী!

চারজনেই হাসলেন। যে কালো মেঘ বিয়েবাড়ির ওপর নেমে এসেছিল, তা সরে গেল। আবার প্রাণ ফিরে পেল বিয়েবাড়ি। স্থির হল, এগারোটা তেতাল্লিশের লগ্নেই বিয়ে হবে। পুরোহিতজী বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন। লোক গেল তাঁকে ডেকে আনতে।

কৃষ্ণা প্রবল আপত্তি তুলেছিল।

নিজের ঘরে বিছানায় আধ-শোওয়া অবস্থায় শুনছিল কাজলের পালিয়ে যাবার কথা। হরিদয়ালবাবুর চূড়ান্ত অপমানের কথা ঝি বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলায় কৃষ্ণা প্রাণভরে উপভোগ করছিল। এই সময় বারান্দায় কথাবার্তার শব্দ পেয়ে বলল, দেখ তো সাবিয়া, ওখানে কে কথা বলছে?

সাবিয়া উঁকি মেরে দেখে চোখ বড় বড় করে বলল, কেউ কথা বলছে না তো! দাদাবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। মা হরিদয়ালবাবুর মেয়েকে নিয়ে সিঁড়ির দিকে গেলেন।

—বলিস কি! বিছানা থেকে একরকম লাফ দিয়ে নামল কৃষ্ণা। কাজল আমাদের বাড়িতে এসেছে? ব্যাপারখানা কি?

কৃষ্ণা বাগানের দিকের জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল সাবিয়ার কথাই ঠিক। স্নেহপ্রভা কাজলকে সঙ্গে নিয়ে বাগান পেরিয়ে রাস্তায় নামলেন। গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে সন্দেহের অবকাশ নেই। জানলার কাছ থেকে সরে এসে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এল সে। কাঞ্চন রেলিং ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

—দাদা।

—উঁ!

—কাজল এখানে এসেছিল কেন?

—নিজের বিয়ে ভণ্ডুল করবার জন্তে আমাদের বাগানে লুকিয়ে ছিল। অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। হরিদয়ালবাবুর মান-সম্মান একমাত্র আমরাই এখন বাঁচাতে পারি।

—অর্থাৎ....

কাঞ্চন শান্তগলায় বলল, কাজলকে আমি বিয়ে করছি কৃষ্ণা।

ভূত দেখার মত কৃষ্ণা কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

বিকৃত গলায় বলল, ওই বেহারী মেয়েটাকে তুমি বিয়ে করবে! তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল! বুঝেছি, কাজলের বিয়ে ভণ্ডুল করার মূলে আছেন মা। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল....

—না, তুমি বুঝতে পার নি। মাকে অযথা দোষারোপ করা তোমার উচিত হচ্ছে না।

—একটা বেহারী মেয়েকে বিয়ে করে তুমি লোক হাসাতে পারবে না দাদা।

—এ ব্যাপারে তুমি ইণ্টারফেয়ার নাইবা করলে! সমস্ত যুক্তি তোমার স্বপক্ষে, আমি জানি। জেনেও আমার কিছু করবার নেই। মাকে কথা দিয়েছি, সেকথা আমায় রাখতেই হবে।

—ওই সঙ্গে নিজেরও ষোল আনা ইচ্ছে আছে! চেহারা দেখেই ভুললে দাদা? ওদের সঙ্কীর্ণ স্বভাবের কথা চিন্তা করে দেখলে না?

—কৃষ্ণা !!!

কাঞ্চনের গলার আওয়াজে এমন কিছু ছিল যাতে কৃষ্ণা আর কিছু বলল না। দ্রুতপায়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

এদিকে, মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে খবরটা। এই নাটকীয় ঘটনা-বিন্যাসে সকলেই হতবাক। এই ধরনের বিয়েতে বিহারী মহলে বিশেষ অসন্তোষ দেখা দিল। অনেকে বিদ্রূপাত্মক ছড়া কেটে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে লাগলেন। জোর করে বিয়ে বন্ধ করে দেওয়া যায় কিনা কেউ কেউ সেই চিন্তা করতে লাগলেন।

আবার উদারনৈতিক মনোভাবাপন্ন লোকেরা হরিদয়াল ও শঙ্করনারায়ণের

প্রশংসা করলেন। অনেকে বললেন, শ্রীনেহরু জাতীয় সংহতির যে স্লোগান তুলেছেন মুঙ্গেরে এই বিয়ে হবে সেই সংহতির প্রথম পদক্ষেপ। অবশ্য যিনি যে মনোভাবই পোষণ করুন না কেন, বিয়েবাড়িতে এলেন সকলেই।

হরিদয়ালের বুক থেকে পাষাণ ভার নেমে গেছে। শুধু তাই নয়, জামাইয়ের মত জামাই তিনি পেয়েছেন। আনন্দে মনোরমার চোখের জল বাধা মানছে না। আঁচল দিয়ে মুছে ফেলছেন বার বার, তবু গড়িয়ে পড়ছে।

তাই দেখে স্নেহপ্রভা বললেন, আ-মর, কেঁদে কেঁদেই যে গেলি!

—কি করব? ইচ্ছে করছে কোথাও গিয়ে প্রাণভরে কাঁদি। এত সুখ কি আমার সইবে ভাই?

সকলে এসে পড়বার পরই বিয়েবাড়িতে কর্মব্যস্ততা বাড়ল।

দীনদয়াল এলেন। কৌশল্যাও এলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে বিয়ে আরম্ভ হল। বাজার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বরের সাজ-পোশাকের কিছুই কেনা গেল না। শঙ্করনারায়ণের বিয়ের জোড় পরে কাঞ্চন বিয়ের পিঁড়িতে এসে বসল। নামমাত্র জামা-কাপড় নিয়ে এখানে এসেছিল। কাজেই, গরম পাঞ্জাবির অভাবে খালিগায়ে শাল জড়িয়ে নিল।

হরিদয়াল প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ইচ্ছে করলে বাঙালী পুরোহিত এনে বাঙালী প্রথায় বিয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শঙ্করনারায়ণ আপত্তি করলেন। তিনি মত প্রকাশ করলেন, যা ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থানুসারেই বিয়ে হোক।

তাই হল। যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে সারা হল অনুষ্ঠানগুলো।

বিয়ে শেষ হল পৌনে দুটোয়।

বিয়ে শেষ হবার পরই কৌশল্যা ও দীনদয়ালকে চলে যেতে দেখে মনোরমা বললেন, ওকি, তোমরা চলে যাচ্ছ যে?

দীনদয়াল বললেন, রাত অনেক হল। এবার আমরা যাই।

—কিছু মুখে দিয়ে যাও ভাই। ধকল তোমাদের ওপর দিয়েও তো কম গেল না। সেই কোন্ সাত-সকালে খেয়ে রয়েছো....

—থাক বৌদি। আমরা বাড়ি গিয়েই না হয় খাব!

মনোরমা অবাক হলেন।

—বাড়ি গিয়ে খাবে মানে ?

গম্ভীরগলায় দীনদয়াল বললেন, আমাদের অনেক আগেই চলে যাওয়া উচিত ছিল। যাই নি শুধু দাদার কথা চিন্তা করে। হাজার হোক কাজল বংশের মেয়ে, তার বিয়েতে না থাকলে দাদাকে অপমানিত করা হবে, তাই। কিন্তু আর নয়....

—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কি হয়েছে ভাই ?

—কি হতে বাকি আছে বৌদি ? চরম কেলেঙ্কারীর জালে তোমরা আমাদের কিভাবে জড়িয়েছ বল তো ?

—যে কেলেঙ্কারী হয়ে গেল, তার জন্যে তো আমরা দায়ি নই। কাজল নিজেই...

তীক্ষ্ণগলায় কৌশল্যা বললেন, মিথ্যে তুমি কাজলের দোহাই দিচ্ছ দিদি। তোমার প্রশ্রয় না পেলে এত বড় সাহস তার হত না।

মনোরমা কোথায় তলিয়ে যান।

—আমার প্রশ্রয় ! ও-কথা তুই বলিস না ছোট !

—কেন বলব না ? প্রশ্রয় ছাড়া কি ? তোমার মনের ভেতরের খবরটা যে রাখি না, তা তো নয় ! পাড়ার এত বৌ থাকতে স্নেহপ্রভার সঙ্গে তোমার এত বন্ধুত্ব কেন ? তার ছেলেকে জামাই করবে বলে এত কাণ্ডকারখানা করবার কি দরকার ছিল ? আমার দাদাকে এভাবে অপমান না করলে কি পারতে না ?

কি বলছে কৌশল্যা। তাঁর পরিকল্পনাতে এই সব হয়েছে ! কাঞ্চনকে জামাই হিসেবে পেয়ে তিনি খুবই আনন্দিতা। মনের অবচেতনে তাকে নিজের করে পাবার একটা আগ্রহ হয়তো তাঁর ছিল। তাই বলে এইভাবে পরিকল্পনা করে লোক হাসাবেন কেন ? এত ছোট তাঁকে ভাবছে কৌশল্যা !

তিনি বললেন, তুই হয়তো ঠিকই বলছিস। সত্যি, আমি কাঞ্চনকে জামাই হিসেবে পেয়ে সুখী হয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস কর, এর মধ্যে কোন পরিকল্পনা ছিল না। কাজল কাণ্ডটা করে না বসলে ওঙ্কারের সঙ্গেই তার বিয়ে হত। সবই ভবিতব্যের কথা। তোর দাদাকে অকারণে অপমান করে আমার লাভ কি ছোট ?

—লাভ-লোকসানের কথা জানি না। তাঁকে চরম অপমানিত করা হয়েছে, এতে তো কোন ভুল নেই। ওই সঙ্গে আমারও বাপের বাড়িতে মুখ দেখাবার পথ বন্ধ হল।....কি দাঁড়িয়ে রইলে যে, বাড়ি যেতে হবে না?

কথা শেষ করে কৌশল্যা এগোলেন।

দীনদয়ালের হাত চেপে ধরলেন মনোরমা।

অনুনয়ের সুরে বললেন, আমাকে ভুল বুঝো না। তোমারা অনুসন্ধান করলেই জানতে পারবে, স্নেহপ্রভা তোমার দাদার মান-সম্মান বাঁচাবার জন্যে নিজে থেকে এই বিয়ের ব্যবস্থা করেছে।

—কথা বাড়িয়ে আর কি হবে? যা হবার তা হয়ে গেছে।

—এস না! কি, হচ্ছে কি?

—যাবার আগে কিছু খেয়ে যাও ভাই।

—আমায় ক্ষমা কর বৌদি।

মনোরমার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দীনদয়াল কৌশল্যাকে অনুসরণ করলেন।

স্তব্ধভাবে ওঁদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মনোরমা। তাঁর অনুমান করে নিতে কষ্ট হচ্ছে না, এ-বাড়িতে কৌশল্যা ও দীনদয়াল আর পদার্পণ করবেন না।

সেই রাত্রেই জয়ন্তকে আসবার জন্যে তার করে দেওয়া হয়েছিল। একে কৃষ্ণার ঘোর আপত্তি ছিল এই বিয়েতে, তারপর যদি সময়মত জয়ন্তকে খবর পাঠান না হয়, তাহলে বাড়িতে কাক-চিল বসতে পাবে না। সমস্ত কাজের আগে তাই জয়ন্তকে তার করা হয়েছিল।

সে এসে পড়েছে আজ সন্ধ্যার ট্রেনে।

ঘটা করে বৌভাত করবেন না শঙ্করনারায়ণ। বেহারী পুত্রবধূ ঘরে আনার দরুন বাঙালী-মহলে বেশ হৈ-চৈ পড়ে গেছে। কষ্টহারিণী ঘাটের বেঞ্চ আঁকড়ে কয়েক ঘণ্টা যে প্রৌঢ়রা প্রত্যহ কাটান, তাঁদের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা হল। শঙ্করনারায়ণের মত ধৃষ্টলোক সমস্ত বাঙালী জাতির

মধ্যে আর আছে কিনা, এ-সম্পর্কে তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করলেন। বার-লাইব্রেরীতে জোর আলোচনা চলল। দু-একজন বেহারী উকীলও এই সরস আলোচনায় যোগ দিলেন।

পুরুষদের চেয়ে মেয়ে-মহলে আলোচনা অনেক বেশি।

প্রত্যহ দুপুরে রণদাকান্ত ডাক্তারের অন্দরে কুড়ি-পঁচিশজন মহিলা একত্রিত হন সেলাই-বোনা করবার জন্যে। বলা বাহুল্য, সেলাই-বোনার চেয়ে পরচর্চাই বেশি হয়। নতুন আলোচনার বিষয় নিয়মিত পাওয়া যায় না। কার মেয়ের বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে, ফ্রক পরিয়ে কে নিজের মেয়েকে খুকু সাজিয়ে রেখেছে, বিয়ের পরের মাস থেকেই কার বৌ পোয়াতি হল—নিজেদের দিনকালের কথা ভুলে গিয়ে এই সমস্ত আলোচনায় তাঁদের দুপুর কাটে। আজ স্নেহপ্রভার চচ্চড়ি-চর্বণ চলছে।

—আমি দীলুর সঙ্গে একবার কাঞ্চনের বিয়ের কথা তুলেছিলুম। মুখ বেঁকিয়ে বলল, ছেলের বিয়ের কথা এখন আমি ভাবতেই পারছি না। ন্যাকামি....ন্যাকামি, বেহারী ছুঁড়িটাকে ছেলের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা যে সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল!

—খেল দেখালে বটে! আমরা যে এসব ভাবতেও পারি না ভাই!

—ভাবতে পারব কিভাবে? মনের মধ্যে তো আর প্যাঁচ নেই। আর ছেলেকেও বলিহারি! মা বললেন, আর অমনি সুড়সুড় করে ছেলে বিয়ে করে ফেললেন!

—ছেলের দোষ কি? বিয়ে আজ দেব, কাল দেব করে দেরি করলে ছেলে তো বিয়ে পাগলা হবেই! তারপর মেয়েটার চেহারার চটক আছে।

—চটকের কথা বল না ভাই। আমাদের দীলু, সতী—এদের চেহারায় কি কম চটক?

—চটক থাকলে কী হবে? আসল ব্যাপার অন্য। তোমরা শুধু স্নেহপ্রভাকেই দোষ দিয়ে চলেছ। ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখ। তলে তলে হয়তো ছুঁড়ি কাঞ্চনের মনকে মজিয়েছিল। তারপর যা হবার তাই হয়েছে। লজ্জা ঢাকবার জন্যে বিয়ে না দিয়ে উপায় কী? মাস তিনেক পরেই শুনবে বাচ্চা হয়েছে।

—মাগো, কি কেলেঙ্কারী ? কাঞ্চনকে তো ভাল ছেলে বলেই জানতুম !

—আর ভাল ছেলে ! ছলা-কলায় ছুঁড়ি মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। পুরুষমানুষের পা হড়কাতে কতক্ষণ ?

—ওই তো বিয়ের ছিরি, তার আবার বৌভাত !

—ঘেন্নায় মরি, ওখানে আবার কেউ পাত পাড়তে যায় ?

বেছে বেছে শ'খানেক লোককে মাত্র আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন শঙ্করনারায়ণ। সকলে আসেন নি। এসেছিলেন মাত্র জনা-ষাটেক। মহিলারা একজনও না। সন্ধ্যার কিছু আগে স্নেহপ্রভা মনোরমাকে ডাকতে গিয়েছিলেন।

মনোরমা এলেন না।

বললেন, এক বছর জামাই বাড়ি আমাদের যেতে নেই। খুব একলা পড়ে গেছিস ! কৃষ্ণা কি....

—কৃষ্ণা ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে আছে। অবশ্য কাজের তেমন চাপ নেই। কেউ তো আসবে না।

—আমাদের জন্যে কিরকম অসুবিধেয় পড়তে হয়েছে তোদের ! মুঙ্গেরের বাঙালীরা এবার থেকে তোদের বোধহয় এড়িয়ে চলবে।

স্নেহপ্রভা বললেন, এড়িয়ে চলে, চলবে। আমাদের এখানে কোন সমাজ নেই, তাই সমাজের অনুশাসন মানবার কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। মুঙ্গেরের বাঙালীরা আমাদের যদি এড়িয়ে চলতে চায়, স্বচ্ছন্দে চলতে পারে।

খাওয়া-দাওয়া চুকতে সাড়ে এগারোটা বেজে গেল।

শেষ অতিথিকে বিদায় দিয়ে শঙ্করনারায়ণ সবে বাড়ির ভেতরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছেন, একটা রিক্সা এসে দাঁড়াল। রিক্সা থেকে নামলেন এক-জন বৃদ্ধা। থান পরিহিতা বৃদ্ধার খয়া ও ঝুঁকে-পড়া চেহারা। মাথায় ধব্ধবে সাদা কদম-ছাঁট চুল। বৃদ্ধাকে দেখে শঙ্করনারায়ণ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

দু পা এগিয়ে এসে বললেন, কে, দিদি !

ভাবনরাণী পোঁটলাটা হাতে নিয়ে এগোতে এগোতে বললেন, চিনতে পেরেছিস তাহলে ? ভাড়াটা মিটিয়ে দে।

ভাবনরাণী শঙ্করনারায়ণের বড় বোন। দুজনের বয়সের পার্থক্য বছর দশেকের। অল্প বয়সে বিধবা হন ভাবন। অত্যন্ত মুখরা হওয়ার দরুন শ্বশুর-বাড়ির সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারেন নি। মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাঁদের বাবা মেয়ের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে গেছেন। ব্যাঙ্কে যে টাকা গচ্ছিত আছে, তার সুদে ভাবনরাণীর বেশ স্বাচ্ছন্দের মধ্যে দিয়ে কাশীতে দিন কাটে। মাঝে মাঝে আসেন মুঙ্গেরে। মুঙ্গেরের বাড়িতে তাঁর অংশ আছে।

ভাবন বাড়ীর মধ্যে গেলেন। বারান্দাতেই স্নেহপ্রভার সঙ্গে তাঁর দেখা হল। আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠলেন স্নেহপ্রভা।

—ওমা, দিদি আপনি!

—খবর পেয়ে আর চুপ করে থাকি কি করে? দেখতে এলাম বাপ-পিতামহর ভিটেতে কেমন ছুঁচোর কেত্তন হচ্ছে।

—কিসের বিষয় বলছেন আপনি?

—বুঝতে যেন পারছো না? ছেলের নাকি বিয়ে দিয়েছো?

এ-বাড়ি যেদিন প্রথম পা দেন স্নেহপ্রভা, সেইদিন থেকে তাঁকে ঘোর অপছন্দ ভাবনরাণীর। কেন যে অপছন্দ, তার সঠিক কারণ বোধহয় তিনি নিজেও জানেন না। আগে মা বেঁচে থাকায় বেশি কিছু ভাইয়ের বৌকে বলার সুযোগ পেতেন না।

এদিকে বহুবছর শঙ্করনারায়ণ বাইরে বাইরে থাকায় তেমন হাতের নাগালের মধ্যে পান নি স্নেহপ্রভাকে। এতদিন পরে বড় রকম একটা সুযোগ তিনি পেয়েছেন। কৃষ্ণার কাছ থেকে এক্সপ্রেস তারটা পাওয়ামাত্র কালবিলম্ব না করে ছুটে এসেছেন এখানে।

কৃষ্ণা অবিকল তার পিসিমার চরিত্র পেয়েছে।

ভাবনরাণীর কথা বলার ধরন দেখে স্নেহপ্রভা আন্দাজ করলেন, তিনি কোমর বেঁধেই কাশী থেকে এসেছেন।

—বলি, মুখে রাটি নেই যে! আর থাকবেই বা কি করে? একটা বেহারী মেয়েকে বাড়িতে ঢোকাতে লজ্জা করল না তোমার?

শঙ্করনারায়ণ এসে পড়লেন।

উত্তর দিলেন তিনি, ঘটনাচক্রে পড়ে বিয়েটা দিয়ে দিতে হল, দিদি!

—ঘটনাচক্রে পড়লে তুই ছেলেমেয়েদের বিষ খাওয়াতে পারিস, বল? ছি ছি নারাণ, তুই শেষটা—তোকেই বা দোষ দেব কি, বোধহয় সবই তোর বৌয়ের কাণ্ড। দেখে গেছি তো সেবার, ওই পাশের বাড়ির বেহারী মাগীটার সঙ্গে কিরকম দহরম-মহরম! তারই মেয়ে নাকি?

—আর ও-নিয়ে আলোচনা করে কি লাভ দিদি? যা হবার হয়ে গেছে।

—লাভ নেই, তুই বলছিস কি? তুই বৌয়ের কথায় যে এরকম ধেই-ধেই করে নাচতে আরম্ভ করেছিস, আমি তো জানতাম না নারাণ! অমন সোনার চাঁদ ছেলের গলায় বেহারী বৌ ঝুলিয়ে দিলি? ছি ছি ছি, কি ঘেন্নার কথা! বাঙালী মেয়ে কি আর ভূ-ভারতে ছিল না? বুড়ো বয়সে তোর বৌ তোকে নাকে দড়ি দিয়ে নাচাচ্ছে? বেশ দেখতে পাচ্ছি, সংসার ছারে-খারে যেতে আর দেরি নেই। তোর বৌ যেদিন দুধে-আলতায় পা দিয়েছিল, সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম, আমাদের বাপ-পিতামহর নাম এই বৌ-ই ডোবাবে।

—তুমি থামবে দিদি?

—কেন থামব বল দিকি? বৌয়ের নামে বলছি বলে গায়ে জ্বালা ধরছে, না? কেন বলতে হয়? অলক্ষুণে কাজ সে করে কেন? বেহারী ছুঁড়িটাকে এ-বাড়িতে জোটাতে তাকে বলেছিল কে?

স্তব্ধভাবে সমস্ত শুনছিল কাজল। বারান্দার লাগোয়া ঘরেই সে বসেছিল। বলতে না পারলেও বাংলা সে ভালই বুঝতে পারে। লজ্জায়-ঘৃণায় তার সমস্ত শরীর রি-রি করতে আরম্ভ করেছে। অন্য সময় হলে কাজল বুঝতে পারত তার অপরাধ কি? কিন্তু দুপুরে কৃষ্ণা তাকে বুঝিয়ে গেছে, তার অপরাধ অনেক। সে বেহারী, সে গরীবের মেয়ে, সে দয়ার পাত্রী। ওই সঙ্গে কৃষ্ণা আরো বলেছে, দয়া করে যখন এ-বাড়িতে স্থান দেওয়া হয়েছে, মাথা উঁচু করে চলার সাহস যেন তার না হয়। সভ্যতা, ভব্যতা, নম্রতা শিখতে হবে, যেমন তেমন করে গ্রাজুয়েট হলেই কোন কৃষ্টিসম্পন্ন বাঙালী ঘরের আদর্শ বৌ হওয়া যায় না। অসংখ্য কথা ঠোঁটের আগায় ভিড় করে এলেও কাজল কিছু বলে নি। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে বসে থেকেছে।

স্নেহপ্রভাও চুপ করে রইলেন। ননদের অজস্র কথার উত্তরে তিনিও দু-চার কথা বলতে পারেন। বলবেন না। পরিস্থিতি আরো ঘোরালো হয়ে

উঠবে। ভাবনরাণী আরো রণরঙ্গিণী হয়ে উঠবেন। তার চেয়ে ভাই-বোনে কথা হচ্ছে, হোক।

শঙ্করনারায়ণও কম বিরক্ত হচ্ছিলেন না। তিনি শান্তিপ্রিয় মানুষ। নিজের জ্যেষ্ঠার সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের। তাঁর জায়গায় অন্য কেউ থাকলে হয়তো পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিত, যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আর একটা কথা শুনতে চাই না। এসেছো, খাও-দাও, থাক।

শঙ্করনারায়ণ বিরক্তি দমন করে বললেন, কথা পরে হবে। অনেকটা পথ ট্রেনে এলে। একটু বিশ্রাম কর। জল-টল খাও।

প্রায় কঁকিয়ে উঠলেন ভাবনরাণী।

—আমার পোড়া কপাল! আবার জল-টল খেতে বলছিস? এ-বাড়িতে কিছু মুখে দেব মনে করেছিস? কিরকম ঘরের মেয়ে এনেছিস তার ঠিক নেই....

—ব্রাহ্মণের মেয়ে, দিদি।

—শুদ্দুরকে বোধহয় ব্রাহ্মণ বলে চালাচ্ছিস। তোদের কথা বিশ্বাস করতেও আর ইচ্ছে করে না। কিন্তু কি কেলেঙ্কারীটা হল বল দেখি? আজ যদি বাবা বেঁচে থাকতেন? হা বিশ্বনাথ, পোড়া চোখে আমায় এ-ও দেখতে হল!

চোখে আঁচল দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন ভাবনরাণী।

—আঃ, থাম....থাম, দিদি। আজকের দিনে আর কেঁদ না।

—ধমকে কি আর চোখের জল বন্ধ করা যায়, নারাণ?

—তোমাকে তো ধমকাই নি, দিদি! হাতজোর করে বলছি, ও প্রসঙ্গ বাদ দাও। এখন কিছু মুখে দিয়ে বিশ্রাম কর। কাল সকালে আমি তোমাকে সমস্ত বুঝিয়ে বলব।

আঁচলের খুঁট থেকে নিজের ঘরের চাবি খুলতে খুলতে ভাবনরাণী বললেন, আমার কথা তোদের ভাল লাগবে না জানি। নিজের ঘরেই যাচ্ছি। মুখে কিছু দিতে বলিস না।

—তুমি মুখে কিছু না দিলে আমিও অভুক্ত থাকব।

—তুই অভুক্ত থাকতে যাবি কোন্ দুঃখে?

তিনি দ্রুতপায়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

ছয়

সাড়ে বারোটা বেজে গেছে।

নিবিষ্ট মনে কাঞ্চন টেবিল ল্যাম্পের আলোয় বই পড়ছে। আজ ওর ফুলশয্যা। মাঝে মাঝে একটু শিহরণ যে বোধ করছে না, তা নয়। বিয়ের পর কাজলের সঙ্গে নিভৃতে ওর সাক্ষাত হয় নি। এখন হবে। কাজল এখন নিজের মনে কোন্ কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে কে জানে!

ঘরে এসে লজ্জায় বোধহয় মাথা তুলতে পারবে না। ওর সুন্দর মুখ আবিরের মত লাল হয়ে উঠবে। আরো সুন্দর দেখাবে নিশ্চয়?

স্নেহপ্রভা কাঞ্চনের ঘরে কাজলকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। এ কাজ তাঁর নয়, কৃষ্ণার। কৃষ্ণা ঘণ্টা দেড়েক আগেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করেছে। তারপর কিছুক্ষণ পরেই ভাবনরাণী রঙ্গমঞ্চে উদয় হয়েছেন।

কৃষ্ণা জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে বলেছে, কেমন শুনছো?

—ভদ্রমহিলার গলার তোড় আছে।

—সাধে কি আর টেলিগ্রাম করে ডাকিয়ে আনিয়েছি? সংসারে অশান্তির ঝড় বইতে থাকবে। কাজলকে বৌ করে আনার মজা মা টের পাবেন।

—পিসিমার একটু গুডবুকে থাক, বুঝলে?

—তোমাকে আর বোঝাতে হবে না। বুড়ির বেশ মোটা রেস্ত আছে। তুমি কি ভেবেছো, বুড়ি মরলে টাকাটা বেহাত হবে? কখনই না। আমার ওপর বেশ ভালবাসা তাঁর আছে, তা সত্ত্বেও তোয়াজের বন্যা বইয়ে দেব।

অগত্যা স্নেহপ্রভাকে কৃষ্ণার কাজটা করতে হল। কাজলকে কাঞ্চনের ঘরে পৌঁছে দিয়ে তিনি নিচে নেমে গেলেন। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় ঘরখানা ছায়াময় হয়ে রয়েছে। কাঞ্চন বই পড়ছে। বুঝতেই পারে নি, কাজল ঘরে এসেছে।

কাজলের মুখের রেখায় রেখায় বিরক্তি। সে এ-বাড়ির যেন অবাঞ্ছিত অতিথি। হরিদয়ালের সম্মান বাঁচানোর জন্যেই দয়া করে তাকে এ-বাড়িতে স্থান দেওয়া হয়েছে, কৃষ্ণা বারবার তার কানের কাছে কথাটা আউড়ে গেছে। তারপর কিছুক্ষণ আগের ওই ঘটনা। বৃদ্ধা মহিলার হেয় ইঙ্গিতগুলো এখনও কানে বাজছে।

মিনিট পাঁচেক কাটল। কাজল দাঁড়িয়ে আছে।

কাঞ্চন বই রেখে উঠে দাঁড়াল। কাজলের দিকে দৃষ্টি পড়তেই বলল, কখন এলে?

কাজল কিছু বলল না।

বড় আলোটা জ্বালল ও।

স্ত্রীর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল কাঞ্চন। অপূর্ব সুন্দর মুখশ্রী, সুগঠনা, দীর্ঘাঙ্গী। ওর মনের মধ্যে মনোরম আবেশ নেমে এল। ওই অনিন্দ্য নারীটি ওর, একান্ত ওর।

—দাঁড়িয়ে কেন? বস।

খাটের এক পাশে বসল কাজল।

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে কাঞ্চন বলল, বিচিত্র ঘটনা পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমাদের দুজনের বিয়ে হয়ে গেল। আমি কোনদিন কল্পনাও করি নি এই-ভাবে আমাকে বিয়ে করতে হবে। কাজল…

—বলুন?

—তুমি কোনদিন ভেবেছিলে, কোন বাঙালী ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে?

—না!

—এরকমটা হবে আমরা দুজনেই ভাবি নি। অথচ আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।

ধীর সংযত গলায় কাজল বলল, আপনি আমাদের ওপর দয়া করেছেন।

—দয়া! তুমি ওভাবে নিও না।

—আর তো কোনভাবে নেবার উপায় নেই।

—না না, তা নয়। তোমাকে বিয়ে করা আমি কর্তব্য বলে মনে করেছি।

—আপনি উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তবে····

—থাক, আমাদের জীবনের এই বিশেষ রাতে ওই সমস্ত গুরুগম্ভীর আলোচনা না-ই বা হল। জান তো, সকাল হয়ে গেলে এ-জীবনে আর এ-রাত ফিরে আসবে না।

প্রচণ্ড শীতেও কাজলের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল। এখন দুর্বল হলে চলবে না। মনকে পরিষ্কার করতেই হবে।

কাজল খাটের ছত্রি একহাত দিয়ে চেপে ধরে বলল, যদি ফিরে না আসে, আমি অসুখী নই। আজকের এই অভিশপ্ত রাত ভোর হয়ে যাক।

কাঞ্চন বিস্মিত গলায় বলল, অভিশপ্ত রাত কেন?

—আপনি বুঝতে পারছেন না?

—না।

—আপনার অনেক দয়া। আমাকে গোত্রান্তরিতা করে সমাজে বাবার সম্মান বাঁচিয়েছেন। আমাকে অনেক লাঞ্ছনার হাত থেকে রেহাই দিয়েছেন। লোকে আপনাকে ধন্য ধন্য করছে। কিন্তু আর কেন—

—আর কেন মানে?

কাজল মরিয়া হয়ে উঠেছে। যে মানুষের সঙ্গে কখনও কথা বলে নি, তারই কাছে লজ্জা-সংকোচের বেড়া ডিঙিয়ে নিজের মনের ভাবকে প্রকাশ করতে হচ্ছে।

—চুপ করে থেকো না। বল, কি বলতে চাইছো?

—তেল ও জল কখনও মিশ খায় না। আমরা দুজনেই সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজে মানুষ হয়েছি। আমাদের দুজনের মধ্যেকার ব্যবধান কখনই কাছাকাছি হবে না। নানা বিষয় নিয়ে ঠোকাঠুকি ও অশান্তিকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারব না।

—ছেলেমানুষ তুমি। ইচ্ছে করলেই সমস্ত কিছুকে এড়িয়ে যাওয়া যায়।

—যায় না। আমি জানি এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। ছোটবেলা থেকেই নানা কারণে আমি বাঙালীদের ঘৃণা করতে শিখেছি। আর আপনারাও আমাদের ঘৃণা করেন, আমি জানি।

—কে বলল, তুমি বেহারী বলে আমি তোমাকে ঘৃণা করব?

কাজল মিনতির সুরে বলল, আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। আমার অনুরোধ রাখুন। আমাকে রেহাই দিন। জানি, আপনার ঋণ এ-জীবনে শোধ করা যাবে না। তবু অনুরোধ না করে উপায় নেই।

কাঞ্চন স্তম্ভিত হয়ে কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইল কাজলের ঘর্মাক্ত সুন্দর মুখের দিকে। তার সমস্ত সুখ-স্বপ্ন বালির বাঁধের মত ধসে পড়ছে।

—তুমি রেহাই চাইছো ?

—জোর খাটালে আপনাকে বাধা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। অনেক দয়া করেছেন। আর একটু দয়া করুন।

কাঞ্চন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, বেশ, তুমি যদি খুশি হও, তোমার অনুরোধই রাখব।

আলনা থেকে গ্রেট কোটটা তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কাঞ্চন।

ঘড়িতে এলার্ম দেওয়া ছিল। খুব ভোরে এলার্মের শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল স্নেহপ্রভার। গায়ে চাদর জড়িয়ে নিয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখার উদ্দেশ্য হল, ভাবনরাণী ওঠার আগেই মিছরীর জল করে রাখবেন স্নেহপ্রভা। সকালে উঠে প্রত্যহ তিনি মিছরীর জল খান। কাশীতে নিজেই করে নেন। এখানে করে না রাখলে মুখে ফোয়ারা ছুটবে।

মিছরির জল তৈরী করে, পূজোর ঘরের তাকে ঢাকা দিয়ে রেখে স্নেহপ্রভা ওপরে এলেন। কাঞ্চনের ঘরের দরজা খোলা। আলো জ্বলছে। বিস্মিত হলেন। কেমন একটু খটকাও লাগল। ইতস্তত করে ঘরে প্রবেশ করলেন।

কাজল খাটের ছত্রিতে হেলান দিয়ে বসে ঘুমোচ্ছে। তার সযত্নে বাঁধা খোঁপা ভেঙে পড়েছে। শিথিল হাত দুটো কোলের ওপর। কাঞ্চন ঘরে নেই। বিছানার দিকে তাকালেন স্নেহপ্রভা। নিভাঁজ শয্যা। কেউ যে ব্যবহার করে নি বুঝতে পারা যাচ্ছে।

কাঞ্চন কোথায় গেল ? অসংখ্য চিন্তা স্নেহপ্রভাকে উতলা করে তুলল। বিশেষ কিছু হয়েছে নিশ্চয় ? এ-ঘর সে-ঘর খুঁজে শেষে কাঞ্চনকে পাওয়া

গেল পড়ার ঘরে। চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর মাথা রেখে ও ঘুমোচ্ছে। একটা ওভারকোট গায়ের ওপর চাপান। অসংখ্য মশা উড়ছে মুখের চারপাশে।

ওকে মৃদু ঠেলা দিলেন স্নেহপ্রভা।

—খোকা—এই খোকা—

— উঁ ? মুখ তুলে ঘুম জড়িত চোখে কাঞ্চন বলল, মা, তুমি....

—তুই এখানে ঘুমোচ্ছিস যে ?

এই প্রশ্নে কাঞ্চনের মনের মধ্যেটা উদ্বেল হয়ে উঠল। ইচ্ছে হল সমস্ত কথা মাকে বলে দেয়। কিন্তু বলি-বলি করেও বলল না।

—না, মানে ...পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—পড়ার ঘরে তুই এলি কখন ? আমি যখন কাজলকে পৌঁছে দিয়ে এলাম, তখন তো তুই ঘরেই ছিলি ?

—তারপরই চলে এসেছি।

—নিজের ঘর ছেড়ে তুই চলে এলি কেন ?

—ইচ্ছে হল একটু পড়ার ঘরে গিয়ে বসি। পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, আমি নিজেই জানি না।

—বাজে কথা বলছিস। দেখে মনে হল সারা রাত্রি কাজলও বিছানায় শোয় নি। কি হয়েছে আমায় বল ?

কাঞ্চন দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে বলল, কি আবার হবে ? কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে তো! এখন কিন্তু আমি তোমায় কফির জন্যে বিরক্ত করব।

স্নেহপ্রভা আর কিছু বললেন না।

অনুমান করলেন একটা কিছু নিশ্চয় হয়েছে। কাঞ্চন বলতে না চাইলেও ওর পড়ার ঘরে রাত ভোর অতিবাহিত করা এবং মুখ-চোখের অবস্থা দেখে সহজেই বুঝতে পারা যায়। কেন-ই বা না হবে ? এই ধরনের বিয়ের পর সমস্ত দিক সুষ্ঠুভাবে রক্ষা পাবে, এটা স্নেহপ্রভার ভেবে নেওয়াই অন্যায়।

তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার মুখে তিনি বললেন, হাত মুখ ধুয়ে নে। আমি এখুনি কফি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সারাদিনের মধ্যে কাঞ্চনের সঙ্গে কাজলের দেখা হয় নি। অধিকাংশ সময় কাজল থেকেছে নিজের ঘরে, তারপর স্নেহপ্রভার সঙ্গে। ভাবনরাণী ঘুম থেকে উঠে কাপড় ছেড়ে, পূজো-আহ্নিক সেরে, ফাতোয়া জারি করলেন, কাজল হেঁসেলের দিকে গেলে তিনি এক মুহূর্ত এ-বাড়িতে থাকবেন না।

বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে। স্নেহপ্রভার ইচ্ছে করেছে শুনিয়ে দেন দু-কথা। নতুন বৌ হেঁসেলের দিকে কখনই যাবে না, জানা কথা। আর যদি যায়ও, তাতে তাঁর কি? বিধবা মানুষের তো আমিষ হেঁসেলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই? শঙ্করনারায়ণ মনে কষ্ট পাবেন বলে কিছু বলেন নি।

সারাটা দিন কাঞ্চন বইয়ের মধ্যে ডুবে রইল। বহু চেষ্টা করেও নিজের মনমরা ভাব ঝেড়ে ফেলতে পাবল না। সূর্যদেব এক সময় বিদায় নিলেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ক্রমে দশটা বাজল। খাওয়া-দাওয়া সেরে কাজল শুতে এল নিজের ঘরে।

টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল কাঞ্চন। কাজলকে দেখে বলল, আমি তোমাবই জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। একটা কথা বলার আছে।

—বলুন?

—মাকে আমি খুব ভালবাসি। কোন কারণে তিনি দুঃখ পান, তা আমি চাই না। আমাদের মধ্যেকার সম্পর্কের বিষয় তিনি জানতে পারলে খুবই দুঃখিত হবেন। আমার ইচ্ছে নয়, কথাটা তাঁর কানে যায়।

—বেশ।

—আমার আর কিছু বলার নেই।

কাঞ্চন দরজার দিকে এগোল।

—শুনুন…

কাজলের ডাকে ফিরে দাঁড়াল কাঞ্চন।

—রাত্রে কোথায় শোবেন?

—পড়ার ঘরে।

—আপনার মা আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি কেন রাত্রে পড়ার ঘরে ছিলেন। আমি উত্তর দিতে পারি নি।

—মাকে যা বলার আমি বলব। কাল থেকে এই প্রশ্নের মুখোমুখি তোমায় হতে হবে না। কথাটা তোমাকে বলে রাখাই ভাল। তোমার কোনরকম অসুবিধে হোক, আমার তা অভিপ্রেত নয়। আমি এখানে থাকলে তুমি অসুবিধেয় পড়বেই। স্থির করেছি, কাল সন্ধ্যার ট্রেনে কলকাতা চলে যাব।

—কলকাতা চলে যাবেন ?

—হ্যাঁ।

—আমার সুবিধে করতে গিয়ে নিজের অসুবিধে করছেন কেন ? আমি বরং কাল বাড়ি ফিরে যাব।

—ফিরে যাবে? তোমার ইচ্ছে। কিন্তু আমাকে কলকাতা যেতেই হবে।

কাঞ্চন ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

লোকটার ওপর সহানুভূতি হয় কাজলের। কিন্তু তাই বলে যারা শিক্ষা ও রুচির দোহাই দিয়ে অন্যকে তুচ্ছ মনে করে, তাদের প্রতি সে সহযোগিতার মনোভাব দেখাতে পারে না। অবস্থা বিপাকে কাজল এইরকম এক পরিবারে এসে পড়েছে, তবু নিজের সঙ্কল্প থেকে চ্যুত হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। অবশ্য কাঞ্চন ধন্যবাদের পাত্র। সে ভাবতে পারে নি, তার কথা এত তাড়াতাড়ি ও মেনে নেবে।

সাত

পরের দিন সকালে কফি খেতে খেতে কাঞ্চন বলল, আজ বিকেলের ট্রেনে আমি কলকাতা ফিরে যাব, মা।

—এখন তো তোর যাওয়া হবে না বাবা!

—কেন মা ?

—আমাদের মত মনোরমাও অষ্টমঙ্গলা করবে বলেছে। আর ক-টা দিন থেকে, অষ্টমঙ্গলা কাটিয়ে যা।

—ও-সমস্ত হ্যাঙ্গামায় দরকার নেই। বিয়ে করব বলে লম্বা ছুটি কি নিয়েছিলাম ? এখন আমার একদিনও কামাই করার উপায় নেই। গরমের মুখে দিন কুড়িকের ছুটি নিয়ে আসব বরং।

—কি আর বলব ! থেকে গেলে ভাল করতিস। হ্যাঁরে, কাজল জানে তো, তুই আজ কলকাতা যাচ্ছিস ?

—কাল তো বলেছি।

এই আলোচনার ঘণ্টা দুয়েক পরে কাজল এসে সসংকোচে স্নেহপ্রভাকে বলল, আমি একবার ও-বাড়ি থেকে ঘুরে আসব ?

স্নেহপ্রভা পুত্রবধূর সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, মন কেমন করছে ?

কাজল চুপ করে রইল।

—ঘুরে এস কিছুক্ষণের জন্যে।

অষ্টমঙ্গলার আগে বৌকে বাপের বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেওয়া ঠিক রীতিসম্মত নয়। স্নেহপ্রভা তবু অনুমতি দিলেন। কোন রীতিকেই যখন মেনে চলা হল না, তখন এই তুচ্ছ ব্যাপারে বাধা দিয়ে লাভ কি ?

কাজলের পরিকল্পনা অন্যরকম। এখন যাচ্ছে—আর এ-বাড়ীতে আসব না, স্নেহপ্রভার মুখের ওপর এ-কথা সে কখনই বলতে পারবে না। তার চেয়ে কিছুক্ষণের জন্যে যাওয়ার অনুমতি নিয়ে আর ফিরে না এলেই তিনি আসল কথা বুঝতে পারবেন। বোধহয় দুঃখ পাবেন। কাজল নিরুপায়।

এ-বাড়ি থেকে বেড়িয়ে প্রথমে সে বাপের বাড়ি গেল না। গেল ঊর্মিলার ওখানে। তাকে দেখে সহর্ষে স্বাগত জানাল ঊর্মিলা।

—আয় আয়, কি সৌভাগ্য ! তুই যে আসবি, আমি ভাবতেই পারি নি। নিজের বিয়েতে কি কাণ্ডটা করলি বলতো ? যাক, শেষ ভাল যার সব ভাল। মনের মত বর পেয়ে খুব খুশি তো ?

কাজল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিছানার ওপর বসল।

—বরের সঙ্গে ভাব হল ? নিয়মিত কথা-টতা বলছিস ? প্রথম রাত্তিরের কথা বল ? ভদ্রলোককে দেখলে তো অত্যন্ত স্মার্ট মনে হয়। কথা আরম্ভ করেছিল কিভাবে ?

—প্রশ্নের তো একেবারে হরিরলুট করে দিলি।

—দেবই তো ! আমার বিয়ের পর তুই আমায় কিভাবে ছিঁড়ে খেয়েছিলি মনে নেই ? সখি, নিজেকে উজাড় করে দিয়ে এসেছো, আর যত লজ্জা আমার কাছে।

ঊর্মিলা খিল খিল করে হেসে উঠল।

কাজল গম্ভীরভাবে বলল, তুই যা ভাবছিস, তা নয়। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিষ্কার কথা হয়েছে।

—পরিষ্কার কথাবার্তা তো হবেই। আমার কিন্তু জড়তা কাটাতে পনেরো দিন লেগেছিল। তোর কথা স্বতন্ত্র।

—তুই আবোল-তাবোল বকছিস কেন বলতো ? আমি এসেছি তোর সঙ্গে একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে পরামর্শ করতে। ওঁদের সঙ্গে আমি সম্পর্ক চুকিয়ে এলাম।

—কাদের সঙ্গে ?

—যাঁরা আমার বাবাকে অনেক দয়া করেছেন। সিঁথিতে লাল দাগটা অবশ্য থাকবে। আর কোন সম্পর্ক ওঁদের সঙ্গে আমার থাকবে না। তোর কর্তা তো বোর্ড অব সেকেণ্ডারি এডুকেশনে কাজ করেন। আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা তাঁকে করে দিতে বল না। কিছু লেখাপড়া তো শিখেছি। মেয়ে পড়াতে ভালই পারব।

ঊর্মিলা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল কাজলের মুখের দিকে। বলল, তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? কি সর্বনাশ করেছিস তুই ? আমি তোকে অনুরোধ করছি ভাই, ফিরে যা ! ওঙ্কারকে বিয়ে করতে চাস নি, আলাদা কথা। কিন্তু কাঞ্চনবাবুর মত চৌকস ছেলেকে অবহেলা করছিস কেন ? তাছাড়া যেভাবেই হোক, বিয়ে যখন হয়ে গেছে।

—আমার মনের কথা তুই ঠিক বুঝতে পারবি না। ওঁরা বাঙালী,

আমাদের পদে পদে হেয় প্রতিপন্ন করেই ওঁদের আনন্দ। সমস্ত জীবন আমি মাথা নিচু করে কাটাতে পারব না, ঊর্মি। মরে গেলেও না।

—তুই অতি তুচ্ছ ব্যাপারে জীবনটা নষ্ট করতে চলেছিস দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। ওসব পাগলামী রাখ, বাড়ি ফিরে যা।

কাজল ক্রমেই অধৈর্য হয়ে পড়ছিল

—তোকে কিছু বলতে যাওয়াই ঝকমারি। পাকা বুড়ির মত তুই শুধু উপদেশ দিতে পারিস। তুচ্ছ বলছিস কাকে? যারা নিজের মর্যাদাকে জলের দামে বিকিয়ে দেয়, তাদের আমি মানুষ বলে মনে করি না। প্রত্যেক মেয়েকে যে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করেও স্বামীর ঘর করতে হবে, তার কি মানে আছে? স্বাধীনভাবে জীবন কাটাবার সাধ্য যখন আমার রয়েছে, কেন আমি নিজের সত্ত্বাকে বিকিয়ে দেব, বলতে পারিস?

—তোর মত লেকচার অবশ্য আমি দিতে পারি না। তবে জেনে রাখ, আমাদের দেশের সুন্দরী মেয়েদের স্বাধীনভাবে জীবন কাটাতে গেলে নিজেদের সম্ভ্রমকে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখতে হয়। তুই ক্লান্ত হয়ে পড়বি, দিশেহারা হয়ে পড়বি, একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের জন্যে তোর মন আকুল হয়ে উঠবে।

কাজল মুখ ঢেকে বসে রইল অনেকক্ষণ।

তারপর মুখ থেকে হাত সরিয়ে বলল, তুই যা বললি সবই ঠিক। মানুষ পশু হয়ে যাচ্ছে, আমি জানি ঊর্মি। তবু আমাকে চেষ্টা করে দেখতে হবে। আমার ধারণা ছিল, আমার এই অসহায় অবস্থায় তুই আমাকে সাহায্য করবি।

—আমি জেনে-শুনে তোকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিতে পারব না। তুই উদার স্বামী চেয়েছিলি; উনি বলছিলেন, কাঞ্চনবাবুর মত উচ্চমনা ছেলে এ তল্লাটে দুটি নেই। অন্যায় জেদকে আর প্রশ্রয় না দিয়ে তুই ফিরে যা।

কাজল উঠে দাঁড়াল।

—চাকরি করতে করতে এম.এ. পাশ করাই আমার উদ্দেশ্য। ভালভাবে পাশ করতে পারলে, ভাল কলেজে অধ্যাপনা পাব। তখনও কি আমি সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে যেতে পারব না? যাক, চললাম। তোকে বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করিস না।

—তুই আমাকে ভুল বুঝলি কাজল। আমি যা কিছু বলেছি, তোর ভালর জন্যেই বলেছি।

কাজল কিছু বলল না। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুতপায়ে।

ওমপ্রকাশ দালানে বসে রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। রবিবার, অফিস যাবার তাড়া নেই। মুখ তার অসম্ভব গম্ভীর। কাজলের বিয়ের পর থেকেই তার এই ভাব।

হরিদয়াল বাড়ি ছিলেন না। তাঁর এক ছাত্রের পৈতে উপলক্ষে গেছেন শহর থেকে মাইল তিনেক দূরের এক গ্রামে। তিনি যা ভয় করেছিলেন, সেরকম কিছু হয় নি। চাকরি তাঁর আছে। স্কুল-সেক্রেটারী সেদিন বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করলেও পরে আক্ষেপ করেছেন বৃদ্ধের মনে কষ্ট দেওয়ার জন্যে।

মনোরমা দালানের একধারে বসে চাল ঝাড়ছিলেন।

কাজল এল। ঊর্মিলাদের বাড়ি থেকে সরাসরি চলে আসছে সে।

মনোরমা সবিস্ময়ে বললেন, কাজল....

কাজল সপ্রতিভভাবে বলল, চলে এলাম!

—শাশুড়ি যে বড় ছেড়ে দিল?

—মিছি মিছি তিনি আমায় আটকাবেন কেন?

মনোরমা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ওমপ্রকাশ তাঁকে বাধা দিল।

খবরের কাগজটা একপাশে সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মা, তুমি থাম। এখন আমায় কিছু বলতে দাও।

শঙ্কিতা মনোরমা ছেলের মুখের ভাব দেখে বললেন, তুই আবার কি বলবি?

মা-র কথার উত্তর না দিয়ে কাজলের সামনে এসে দাঁড়াল ওমপ্রকাশ।

—তুমি এসে পড়ে ভালই হয়েছে। নইলে আমাকেই হয়তো ওখানে গিয়ে কথাগুলো বলে আসতে হত।

কাজল উৎসুকভাবে তাকাল।

—এ বাড়িতে তোমার আর আসা চলবে না।

মনোরমা স্তম্ভিত। কাজল হতবাক!

—কেন?

—প্রশ্ন করতে লজ্জা করছে না? কেলেঙ্কারীর বাকি তো কিছু রাখ নি! আবার এসেছো আদর কাড়াতে! কারখানায় মাথা তুলে কাজ পর্যন্ত করতে পারি না। যেখানে যাই, ওই এক কথা। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা পর্যন্ত আমাকে দেখলে ছড়া কাটে। তোমার জন্যে আমাদের কি অবস্থা হয়েছে, চিন্তা করে দেখেছো কি?

—আমার অনেক অপরাধ। তোমরা আমায় ক্ষমা কর! আমি তোমাদের কাছে আবার চলে এসেছি দাদা! ওখানে আর ফিরে যাব না।

ওমপ্রকাশ খিঁচিয়ে উঠল।

—যাবে না, যেও না। মোট কথা, তোমার এখানেও থাকা চলবে না!

মনোরমা ক্ষীণগলায় বললেন, উনি বাড়ি নেই। এসব কি বলছো তুমি?

—বাবা বাড়ি নেই বলেই আমাকে বলতে হচ্ছে। তিনি থাকলে আমি তাঁকে বলতে বাধ্য করতাম। আগে যখন বলতাম, কান দাও নি। এখন দেখতে পাচ্ছ তো, তোমরা আদর দিয়ে মেয়ের পরকাল কিরকম ঝরঝরে করে দিয়েছো?

রুদ্ধ অভিমানে চোখ ফেটে কাজলের জল বেরিয়ে আসছে। শরীরটা কেমন গুলিয়ে উঠছে। পা কাঁপছে থর থর করে। মরীয়া হয়ে সে বলল, আমি চিরদিন এ-বাড়িতে থাকতে আসি নি। আমাকে শুধু এম এ পাশটা করার সুযোগ দাও। তারপরই আমি নিজের পথ দেখে নেব।

—তোমাকে সুযোগ দেবার আমরা কে? তোমার বিয়ে হয়ে গেছে। তোমাকে সমস্ত সুযোগ-সুবিধে দেওয়ার দায়িত্ব এখন তাদের। এতদিন জ্বালিয়েছো, বিয়ের পরও জ্বালাতে এসেছো?

—ওম, কি হচ্ছে?

—তুমি থাম মা! যার জন্যে আমাদের পরিবারের সমস্ত সম্মান মুঙ্গেরের রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে, তাকে এখনও সহানুভূতি দেখাচ্ছো?

কাজল নিজেকে ফিরে পেয়েছে আপ্রাণ চেষ্টায়। কেন সে এত ছোট হতে গেল! চেষ্টা করেও সে চোখের জলকে সামলাতে পারল না।

ধরাগলায় বলল, আমার ভুল ভেঙে দিয়ে তুমি অসীম উপকার করলে,

দাদা। কেন আমি তোমাদের কাছে ছুটে এসেছিলাম; ভাবতেই এখন লজ্জা করছে! আমি চললাম মা। এই আমার এ-বাড়িতে শেষ আসা। ভয় নেই, আর এমন কোন কাজ করব না, যাতে তোমাদের মান-সম্মান আবার মুঙ্গেরের রাস্তায় গড়াগড়ি যায়।

মনোরমা কিছু বলতে গিয়ে বলতে পারলেন না। তাঁর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে। কাজল দ্রুতপায়ে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

ভাবনরাণী গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিলেন। কাশীতে গঙ্গাস্নান করে যে সুখ, এখানে সে সুখ নেই। যদিও এখানকার গঙ্গা অনেক পরিষ্কার; স্রোতের প্রবল তোড় নেই, উত্তরবাহিনীও বটে। তাছাড়া ঘাটগুলিতে লোকের ভিড় নেই। পরম শান্তিতে, কারুর ঠেলা সহ্য না করে স্নান করা যায়। এই নির্জনতাই ভাবনরাণীকে অসুখী করে তোলে। কাশীর ঘাটে ঘাটে বিধবা বুড়ির সমাবেশ। নাম মাত্র স্নান সেরে, পরের কেচ্ছা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা চালিয়ে যেতে অসুবিধে নেই।

গঙ্গার ঘাট থেকে ফিরে আসার পরই তিনি সংবাদটা পেলেন।

কৃষ্ণা বলল, শুনেছো পিসিমা, নতুন বৌ বাপেরবাড়ি গেছে!

প্রথমে তিনি ধরতে পারলেন না কৃষ্ণা কি ইঙ্গিত করতে চাইছে।

—বেহারীদের না হয় অষ্টমঙ্গলা হয় না। আমাদের তো কল্যাণ-অকল্যাণ আছে। আট দিনের আগেই বাপেরবাড়ি যাওয়া কি উচিত?

ভাবনরাণী গলা ছাড়লেন।

—বলিস কি! বাপেরবাড়ি গেছে? কি অলক্ষুণে কথা মা! এত বেপরোয়া কি ভাল? এ বৌ ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়বে!

—আদর—আদর, পিসিমা! বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৌয়ের মাথা মা চিবিয়ে খাচ্ছেন। অনুমতি নিয়েই সে বাড়ি গেছে নাকি!

—সারাটা জীবন নারায়ণকে জ্বালিয়ে খেলে তোর মা। কাঞ্চনের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে এই বেহারী ছুঁড়িটা। আমাদের অমন সোনার চাঁদ ছেলে, ছদিনেই একেবারে কালিবর্ণ হয়ে গেছে গো!

স্নেহপ্রভা কাছেই ছিলেন। সমস্ত শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি। এই আলোচনায় বাধা দেবার প্রবৃত্তি তাঁর হচ্ছিল না। আবার বাধা না দিয়েও উপায় নেই। বাধা না দিলে কতক্ষণ চলবে তার স্থিরতা কি ?

তিনি কুটনো ফেলে উঠে এলেন।

—কৃষ্ণা, কি হচ্ছে ? কেন এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা বাড়াচ্ছো ? আমি যখন তাকে বাপেরবাড়ি যাবার অনুমতি দিয়েছি, ভাল বিবেচনা করেই দিয়েছি নিশ্চয়ই !

ভাবনরাণী ঘাড় বেঁকিয়ে বললেন, ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝগড়া করতে এলে যে ? মানুষ অশৈলিনপনা দেখলেই বলে ! এমন কাজ না করলেই তো পারতে, কেউ বলত না কোন কথা !

—যা ফেরাবার নয়, তা নিয়ে আলোচনা বাড়িয়ে কি লাভ ? তাছাড়া খোকা যখন কাজলকে মেনে নিয়েছে····

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে কৃষ্ণা বলল, মেনে নিয়েছে তোমায় বললে কে ?

—খোকার মনের কথা তোমার চেয়ে আমি বেশি জানি, কৃষ্ণা। তোমার কি একবারও মনে হচ্ছে না, মেয়েটার ওপর দিয়ে কত ধকল গেল ? আমাদের আশ্রয়ে যখন এসে পড়েছে, ভালবাসতে না পার, ক্ষমা-ঘেন্না করে ওকে এড়িয়ে গেলেই তো হয় ! বিদ্রূপ করে কাজলের চোখে নিজেকে ছোট করছো কেন ?

কৃষ্ণা ভাবে নি স্নেহপ্রভা এতগুলো কথা বলবেন। কেমন থতিয়ে গেল।

মাথায় ঘোমটা টেনে কাজল করিডর পেরিয়ে দালানে এল এই সময়।

—বিদ্যেধরী ফিরলেন ! ভাবনরাণী মন্তব্য করলেন।

কাজল ওঁদের পাশ কাটিয়ে ওপরে চলে গেল। স্নেহপ্রভা আবার কুটনোয় বসলেন। কাজল নিজের ঘরে গিয়ে দেখল, কাঞ্চন সুটকেসে জামা-কাপড় গোছাচ্ছে। পায়ের শব্দে মুখ তুলে স্ত্রীকে দেখে নিল, আবার নিজের কাজে মন দিল। কাঞ্চন শুনেছিল, কাজল চলে গেছে। তার আর আসবার সম্ভাবনা নেই, এই ধারণাই ওর মনে বদ্ধমূল ছিল। ফিরে আসতে দেখে প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কোন প্রশ্ন করল না।

মিনিট দুয়েক বোধহয় কাজল কাঞ্চনের কার্যকলাপ লক্ষ্য করল।

—আপনি আজই যাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ! পাঁচটার ট্রেনে।

—আমার একটা কথা আছে।

কাঞ্চন অবাক হয়ে কাজলের দিকে তাকাল! ভাবল, আবার কি কথা? চরম প্রস্তাব তো মেনে নিয়েছি, আবার কি ?

—তোমাকে শ্রান্ত দেখাচ্ছে। মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে। একটু বিশ্রাম করে নাও, তারপর তোমার কথা শুনব।

—আমি বেশ আছি। বিশ্রামের দরকার নেই।

—বল!

—আমি আপনার সঙ্গে কলকাতা যাব।

কথাটা এতই আকস্মিক, কাঞ্চনের মনে হল ও ভুল শুনল না তো? নিশ্চিন্ত হবার জন্যে বলল, তুমি কি বললে, আমার সঙ্গে কলকাতা যাবে ?

—হ্যাঁ। আমি আর এখানে থাকব না।

কাজলকে বুঝে উঠতে পারে না কাঞ্চন। প্রথম সাক্ষাতের পর যে সমস্ত কথা বলেছিল, কলকাতায় যাবার এই ইচ্ছেকে তো একসূত্রে বাঁধা যায় না!

স্নিগ্ধগলায় কাঞ্চন বলল, আমার ভাবতেও ভাল লাগছে, তুমি আমার সঙ্গে যাবে! কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নাও।

—কিন্তু…

—আবার কিসের কিন্তু ?

—আপনার মা-বাবার অনুমতি নেওয়ার বোধহয় দরকার হবে।

তাইতো! কাজল যখন সঙ্গে যাচ্ছে, তখন বিশেষ অনুমতির দরকার হবে বৈকি! কাঞ্চন একটু অস্বোয়াস্তি বোধ করতে লাগল। অনুমতি চাইলে নিশ্চিতভাবে পাওয়া যাবে, ও তা জানে। আসল কথা হল, কাজলকে নিয়ে যাবে, এ-কথা বলতে অত্যন্ত সঙ্কোচ হবে।

—অনুমতির দরকার তো হবেই! একটু ঝামেলা দেখা দিল!

কাজল চুপ করে রইল।

—তুমি আমার সঙ্গে যাবে সেজন্যে ঝামেলা বোধ করছি, তা নয়। আমি ভাবছি, সঙ্কোচ কাটিয়ে মায়ের কাছ থেকে অনুমতি চাইব কিভাবে ?

কাজল জানালার দিকে তাকিয়ে বলল, কলকাতা যাওয়ার কথা আপনার মাকে আমার বলতে যাওয়া কি শোভন হবে ?

—না, না। আমাকেই বলতে হবে।

দুজনেই চুপচাপ কিছুক্ষণ।

—আমি কথাটা মাকে বলে আসি।

কাঞ্চন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নিচে স্নেহপ্রভা তখনও কুটনো কুটছিলেন। কৃষ্ণা ও ভাবনরাণীর মধ্যে ফিসফিস করে কি সমস্ত কথাবার্তা হচ্ছিল। কাঞ্চন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতেই নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছে। কোন রকম ভূমিকা না করেই কথাটা পাড়বে।

স্নেহপ্রভার সামনে এসে কেমন থতিয়ে গেল।

ছেলের দিকে তাকিয়ে মা বললেন, কিছু বলবি ?

—ইয়ে....একটা কথা বলবার ছিল মা।

—বল না!

—তোমরা যদি অনুমতি কর, মানে···কাজলকে আমি কলকাতা নিয়ে যেতে চাই!

কথাটা ভাবনরাণী ও কৃষ্ণা দুজনের কানে গেল। ছেলের কথায় স্নেহপ্রভা খুশি হলেন। তিনি যা ভেবেছিলেন, তা নয় তাহলে! সেরকম কোন গোলমাল থাকলে কাঞ্চন কি কাজলকে নিয়ে যেতে চাইত ?

বললেন, কাজলকে কলকাতা নিয়ে যেতে চাস ? বেশ তো, নিয়ে যা!

—বাবা, তাঁর তো···

—তাঁর আপত্তি হবে না। তাঁকে বুঝিয়ে বলব। মনোরমা বলেছিল অষ্টমঙ্গলা করবে। কাজ নেই অষ্টমঙ্গলায়। ওকেও বুঝিয়ে বলতে পারব। তুই ঘরে যা, আমি আসছি কাজলের কাপড়-চোপড় গুছিয়ে দিতে।

কাঞ্চন ঘরে ফিরে গিয়ে বলল, মা মত দিয়েছেন। এখুনি আসছেন তোমার ট্রাঙ্ক গুছিয়ে দিতে।

নিচে তখন আরেক প্রস্থ গোলমাল আরম্ভ হয়েছে। ভাবনরাণী তীক্ষ্ণ গলায় বলছেন, বেহায়াপনার এরকম উৎকট দৃষ্টান্ত তাঁর এত বয়স হল চোখে

পড়ে নি। অথচ কিছুক্ষণ আগে তিনিই কাঞ্চনের প্রশংসা করছিলেন। অবশ্য ভাবনরাণী এ মন্তব্য করতেও ছাড়লেন না যে, স্নেহপ্রভার দোষেই ছেলে বিগড়ে গেছে। উত্যক্ত কাঞ্চন কাজলের দিকে তাকাল। কাজল জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাগান দেখছে, না উৎকর্ণ হয়ে নিচে থেকে ভেসে আসা কথা শুনছে, বুঝতে পারা গেল না।

আট

রাইট টাইমেই দানাপুর ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার ষ্টেশনে এসেছিল। ছাড়ল বিকেল পাঁচটা চল্লিশে—ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেছে। ঘড়ির দিকে না তাকালে মনে হবে, আটটা সাড়ে আটটা তো বটেই। গরমকালে এই সময় কড়া রোদ্দুরে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে।

কাঞ্চন ও কাজলকে ট্রেনে তুলে দিতে স্নেহপ্রভা কুণালকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

বহু চেষ্টা করেও কাঞ্চন ক্যুপে সংগ্রহ করতে পারে নি। ওরা যাচ্ছে ফোর বার্থে। কামরায় দুজনের পরিবর্তে মাত্র আর একজন যাত্রী আছে।

কাঞ্চন দ্রুতহাতে আপার ও লোয়ার বার্থে বিছানা পেতে নিল।

বিছানা পাতা হলে কাজল বসল। কাঞ্চনও বসল। সিগারেট ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, তুমি বিচিত্র। তোমাকে বুঝে ওঠা ভার!

—কেন?

—নিজেই ভেবে দেখ, কেন?

—আমার অসংলগ্ন ব্যবহার আপনাকে বিস্মিত করেছে, জানি। কিন্তু আপনার সঙ্গে কলকাতা যাওয়া ছাড়া আমার তো আর কোন পথ খোলা ছিল না!

মৃদু হেসে কাঞ্চন বলল, এতে সঙ্কুচিত হবার কি আছে! তুমি তো কোন

পরপুরুষের সঙ্গে যাচ্ছ না। নিজের স্বামীর সঙ্গে তার কর্মস্থলে যাচ্ছ। সকলেই যায়।

—আপনি মহৎ।

—ওই নাও, তুমি আবার উপন্যাসের ভাষা আরম্ভ করলে কেন?

হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া কামরার মধ্যে ঢুকছিল।

কাজল কাচের পাল্লা নামিয়ে দিয়ে বলল, আমাকে নিয়ে আপনি অত্যন্ত অসুবিধেয় পড়েছেন, জানি। বিশ্বাস করুন, খুব বেশিদিন আমি আপনাকে বিরক্ত করব না।

—তার মানে?

—কলকাতায় গিয়ে আমি এম.এ. পাশ করতে চাই। এই অনুগ্রহটুকু আপনার কাছ থেকে আমায় নিতেই হবে।

—অনুগ্রহ নয়। দাবি বল—

—দাবি! না না, দাবিই বা করব কেন? আপনার সঙ্গে পরিষ্কার কথা তো আমার হয়েই গেছে। আমাকে কোন হোস্টেলে ভর্তি করে দেবেন।

—হোস্টেলে?

—হোস্টেল ছাড়া কলকাতায় কোথায় থাকব? আমার বিন্দুমাত্র উপায় থাকলে আপনাকে এইভাবে বিরক্ত করতাম না।

কাঞ্চনের হাল্কা মন আবার ভারি হয়ে উঠল। কাজল কলকাতা যাবার প্রস্তাব করতেই, ও ভেবেছিল মেঘ কেটে গেছে। সাময়িক উত্তেজনা কেটে যাবার পর ওর সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যে তৎপর হয়েছে।

কাজলের এখনকার কথাবার্তা শুনে কাঞ্চন বুঝতে পারল, কল্পনায় যে মিনার তৈরি করেছিল, বাস্তবে তার দর্শন কখনই হয়তো পাওয়া যাবে না। কাঞ্চন আর কিছু বলল না। বিরস মুখে বসে ঘন ঘন সিগারেট টানতে লাগল।

দানাপুর ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার পূর্ণ গতিতে ছুটে চলেছে।

কলেজ-জীবনের শেষের দিকে কাঞ্চন থাকত বৌবাজারের একটা মেসে। ভাল চাকরি পাবার পর ওই মেসের ফোর সিটেড রুমে থাকতে ওর মন চাইল না।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমীর আলী এভিনিউয়ে ঘর পেল। ভাড়া একটু বেশি হলেও ঘরখানা খারাপ নয়। মাসখানেক থাকার পর কাঞ্চনের আর ওখানে মন টিকল না। ঘর ভাল হলে কি হবে, পরিবেশ ভাল নয়।

ফ্ল্যাট বাড়ির বেশির ভাগ বাসিন্দাই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। দিনের আলোয় তারা বেশ শান্তশিষ্টই থাকে। সন্ধ্যা হবার পরই তাদের অন্যরূপ। ঘরে ঘরে মেয়ে-পুরুষ মদ খেয়ে বেহেড হয়ে পড়বে। অশ্রাব্য গালাগালির ফোয়ারা চলবে। এমনকি সিঁড়ি বা বারান্দায় রক্তগঙ্গাও বয়ে যায় কখনও কখনও।

কাঞ্চন কোন ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত নয়। অফিস থেকে ফিরে নিজের আস্তানায় এসে বই-টই পড়া তার অভ্যাস। কিন্তু সে উপায় নেই মাতাল অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানগুলোর জ্বালায়। বাড়িওয়ালা বাঙালী। তাঁর কাছে গিয়ে কাঞ্চন বলল সব কথা।

তিনি পান চিবোতে চিবোতে মন্থরগলায় বললেন, আমি কি করব মশাই? আপনি তো দেখে-শুনেই এসেছেন। ইচ্ছে করলে পুলিশে রিপোর্ট করতে পারেন। অবশ্য কিছুই হবে না। আমার কথা শুনুন, অন্যত্র ঘরের চেষ্টা দেখুন। আমি তো বুঝি, কোন বাঙালীর ছেলেই ওই মাতালদের সঙ্গে থাকতে পারবে না।

আবার ঘর খোঁজার পালা।

অফিসের একজন পরামর্শ দিলেন, রেস্ত না ছাড়লে কলকাতা শহরে ঘর পাওয়া যায় না। কিছু ছাড়ুন, দেখবেন, ঘরের কিউ লেগে গেছে!

—ভাল ঘর পেলে আমি টাকার দিকে তাকাব না। এই বিরাট শহরে কোথায় ঘর খালি আছে তার সন্ধান কিভাবে পাব, বলুন?

—সেই জন্যেই তো কিছু রেস্ত ছাড়তে বলছি। দালাল লাগান। তাতে আপনার কিছু টাকা যাবে, কিন্তু মনের মত ঘর আপনি পেয়ে যাবেন।

দালাল লাগাল কাঞ্চন। ঘর পাওয়া গেল। টার্নার রোডের প্রায় মোড়ে অবিনাশ ম্যানসন। ওই ম্যানসনের দোতলার একখানা ঘর। বাথরুম যুক্ত আছে, কিচেন নেই। কিচেনের দরকারও নেই কাঞ্চনের। ওর দুপুরের ও বিকেলের খাওয়ার ব্যবস্থা অফিসেই। রাত্রের খাওয়া হোটেলে সেরে নেয়।

প্রায় দু-বছর হয়ে গেল টার্নার রোডের ওই ওয়ানরুম ফ্লাটেই আছে সে।

বাড়িওয়ালা অবিনাশবাবুর সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে বেশ। তিনি নিচের তলার একখানা ঘর নিয়ে থাকেন। অমায়িক ভদ্রলোক।

কাজলকে নিজের ফ্ল্যাটে এনে তুলল।

—তুমি একটু বস। আমি বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করে আসছি।

কাজল প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকাল।

কাঞ্চন বলল, আমার এই একখানা ঘর। আরেকখানা ঘর না হলে এখন চলবে না। বাড়িওয়ালাকে গিয়ে বলে দেখি, কোন ব্যবস্থা যদি তিনি করে দিতে পারেন!

অবিনাশবাবু ঘরেই ছিলেন।

কাঞ্চনকে দেখে উৎফুল্লগলায় বললেন, এত তাড়াতাড়ি চলে এলে ভায়া? তুমি দশ দিনের ছুটি নিয়েছিলে না?

—পুরো ছুটিটা কাটিয়ে আসতে পারলাম না। আপনাকে একটা বিশেষ খবর দেব।

—কোন সুখবর কি?

—বিয়ে করেছি!

—অ্যাঁ, বলা নেই কওয়া নেই বিয়ে করলে কিরকম?

কাঞ্চনকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হল।

—আর বলেন কেন, মা এই কাণ্ডটা বাধালেন!

—গুরুজনেরা বিবেচক না হলে ছোকরাদের তো দিন চলাই মুশকিল হয়ে পড়ে। তোমার মা তোমার ওপর সুবিচারই করেছেন ভায়া। খুশি হলাম। খুব খুশি হলাম। কিন্তু এই খুশি খালিপেটে কি দীর্ঘস্থায়ী হবে?

কাঞ্চন সহাস্যে বলল, মিষ্টি দিয়ে ভরে দিলেই তো হল। সে ব্যবস্থা করছি। কিন্তু তার আগে আপনাকে একটা ব্যবস্থা করতে হবে যে?

—কি ব্যবস্থা ভায়া?

—বেশ মুশকিলে পড়ে গেছি!

—আ-হা-হা, ঝেড়েই কাশ না!

—আমার একখানা ঘর চাই।

সবিস্ময়ে অবিনাশবাবু বললেন, ঘর চাই কিরকম? স্ত্রী ছাড়া সঙ্গে আর

কাউকে এনেছো নাকি ?

– না, আর কেউ আসে নি।

—তবে আর আরেকখানা ঘর নিয়ে কি করবে ? এখন তো তোমাদের সময় হল কবির ভাষায়, দুজনে মুখোমুখি, গভীর ও দুখে-দুখি—বাড়তি ঝামেলায় যাচ্ছো কেন ?

—ঘরখানা বড় ছোট। তাছাড়া কিচেন অ্যাটচ্‌ট নেই তো। বাড়তি ঘর একখানা না হলে কোনমতেই চলবে না।

অবিনাশবাবু ভ্রূ কুঁচকে চিন্তা করতে লাগলেন।

—খুবই বিব্রতয় ফেললে ভায়া! ঘর তো একখানাও খালি নেই। খালি থাকবেই বা কিভাবে! কলকাতার বাজার তো দেখছো। এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে, মানুষ সিঁড়ির তলাকার ফালি জায়গাটায় পর্যন্ত থাকতে চায়।

চিন্তিতগলায় কাঞ্চন বলল, উপায় ?

—এখন কোন উপায় নেই। পরে একটা উপায় হলেও হতে পারে। সবই নির্ভর করবে তোমার ভাগ্যের ওপর। তেতলার এক ভদ্রলোকের দিল্লী চলে যাবার কথা আছে। তিনি যদি যান তাঁর থ্রিরুম ফ্ল্যাটটা পেতে পার।

—খুবই ঝামেলায় পড়লাম। সে ভদ্রলোক কবে যাবে কে জানে!

—দু-চার দিন কয়রকস্তি করেই থাক না, দেখবে কি মাধুর্যের সরোবরে হাবুডুবু খাচ্ছ! বুঝলে ভায়া, অবিনাশ ম্যানসন তখন হয় নি। গিন্নী বেঁচে। আমরা থাকতাম নিয়োগীপুকুরের এক বস্তিতে। টিনের চাল আমাদের মাথায় ঠেকত। কিন্তু কি আরামেই ছিলাম, আহা—! তাই বলছিলাম, আনকোরা নতুন জিনিস যত কাছে রাখবে, ততই মন ভরে উঠবে।

অবিনাশবাবু ঘর ফাটিয়ে হাসলেন।

কাঞ্চন আর দাঁড়াল না। ফিরে এল নিজের ঘরে। কাজল উদ্বিগ্নমুখে দাঁড়িয়ে ছিল খাটের পাশে। তার দিকে তাকিয়ে বলল, ঘর পাওয়া গেল না।

কাজল সহজগলায় বলল, আপনি মিথ্যে ঘরের চেষ্টা করতে গিয়ে সময় নষ্ট করলেন। আমরা বোর্ডিং-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লে কোথাও-না-কোথাও ঠিক জায়গা পেয়ে যাব।

—বোর্ডিং ?

—শুনেছি, এখানে মেয়েদের অনেক বোর্ডিং আছে।

—আছে! কিন্তু সেই সব বোর্ডিং-এর সন্ধান আমার জানা নেই।

—এতদিন কলকাতায় আছেন, এটুকু খবরও রাখেন না?

কাজলের গলায় শ্লেষের আমেজ।

মাথার মধ্যে রক্ত নেচে উঠল কাঞ্চনের। তবু সংযত গলাতেই বলল, আগে আমি ধারণাই করতে পারি নি, মেয়েদের বোর্ডিং হাউসের বিষয় খোঁজ না রাখাটা আমার বিরাট একটা ডিসকওয়ালিফিকেশন।

তার কথায় কাঞ্চন আঘাত পেয়েছে বুঝতে পেরে কাজল নরমগলায় বলল, আমি আঘাত দিয়ে কথাটা আপনাকে বলতে চাই নি।

কাঞ্চন প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল।

— তোমার খিদে পেয়েছে?

কাজল চুপ করে রইল।

—লজ্জা করলে কিন্তু নিজে ঠকবে। আমার খুব খিদে পেয়ে গেছে।

—আমারও।

—বাথরুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে নাও। ইচ্ছে করলে কাপড়ও বদলাতে পার। মোড়ের মাথায় একটা রেষ্টুরেণ্ট আছে, আমাদের ওখানে গিয়ে খেয়ে আসতে হবে।

কাজল সুটকেস থেকে কাপড় বার করে নিয়ে বাথরুমে গেল।

অবিনাশ ম্যানসন থেকে সাঙ্গুভ্যালী বেশি দূরে নয়। ওরা হেঁটেই রেষ্টুরেণ্টে এসে ঢুকল। কেবিন খালি ছিল।

মেনু দেখতে দেখতে কাঞ্চন বলল, তুমি মাংস খাও তো?

— খাই।

—তোমরা অনেকেই তো মাংস খাও না, তাই জিজ্ঞেস করলাম।

বয় খাবারের অর্ডার নিয়ে গেল।

দুজনেই চুপচাপ খেয়ে চলেছে। একসময় কাজল বলল, মেয়েদের বোর্ডিং না পাওয়া গেলেও অসুবিধে হবে না। ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন হয়ে গেলে ওখানকার বোর্ডিং-এ জায়গা পেয়ে যাব।

—মেয়েদের আলাদা হোষ্টেল ইউনিভার্সিটির আছে কিনা আমি জানি

না। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। তুমি মায়গ্রেসন সার্টিফিকেট এনেছো তো ?

—মায়গ্রেসন !

—এখানে অ্যাডমিশন নিতে গেলে মায়গ্রেসন সার্টিফিকেটের দরকার হবে।

—কিন্তু·········আমি তো······

—তুমি অন্য প্রদেশ থেকে পাশ করেছো। মায়গ্রেসন সার্টিফিকেট ছাড়া কোনমতেই তুমি এখানে ভর্তি হতে পারবে না।

কাজল কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেল। মায়গ্রেসনের কথা তার যে অজানা তা নয়। তার চোখের ওপরই কত মেয়ে কলকাতা বা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেছে মায়গ্রেসন সার্টিফিকেট নিয়ে। মুঙ্গের থেকে আসার সময় প্রবল উত্তেজনার দরুণ তাব স্মবণ হয় নি, ওই বস্তুটি তারও দরকার হবে। তাছাড়া এখন মনে পড়ছে বি.এ.-র সার্টিফিকেটটাও আনা হয় নি।

দারুণ বিরক্তিতে মন ভবে উঠল কাজলের। ওই সঙ্গে মনে হল, তার দুরবস্থাকে বেশ উপভোগ করছে কাঞ্চন।

কাজল তীক্ষ্ণগলায় বলল, এসমস্ত কথা আমাকে মুঙ্গেরে বলেন নি কেন ?

—তুমি আমার সঙ্গে তো পরামর্শ করতে আস নি। ট্রেনের কামরায় শুনলাম তুমি এম.এ. পড়তে চাও। মায়গ্রেসন সার্টিফিকেটের কথা তো তোমারই ভাবা উচিত !

কাজল কয়েক মিনিট গুম হয়ে বসে রইল। কাঞ্চনের যুক্তিকে খণ্ডন করার কোন পথ নেই। পড়া-শোনা চালিয়ে যেতে গেলে উপায় একটা বার করতেই হবে। মনের মত একটা উপায় চিন্তা কবেও পাওয়া গেল না।

—কি করা যায় বলুন তো ?

—কিসের ?

—অ্যাডমিশন নেওয়ার কথা বলছিলাম।

ন্যাপকিনে হাত মুছে কাঞ্চন সিগারেট ধরাল।

ধোঁয়া ছেড়ে বলল, পাটনা ইউনিভার্সিটি থেকে আনিয়ে নিতে হবে।

—দেরী হবে। তাছাড়া অনেক লেখালিখির ব্যাপার—

—উপায় কি !

কাজল ন্যাপকিনে হাত মুছল। দুজনে ফিরে এল ফ্ল্যাটে।

কাঞ্চন বলল, তুমি দরখাস্ত লিখে রেখো। আমি কাল পাটনায় পাঠিয়ে দেব। এখন আমায় তোমার ঘরের সন্ধানে বেরুতে হবে। রাতভোর ট্রেনের ধকল গেছে, তুমি বিশ্রাম করে নাও।

উত্তরের অপেক্ষা না করে ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আটটার পর একটা নতুন টিফিন-কেরিয়ার হাতে নিয়ে কাঞ্চন ফিরে এল। কাজল তখন জানালার ধারে বিমর্ষভাবে দাঁড়িয়েছিল। সমস্ত দুপুর ও সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঞ্চনের দেখা না পেয়ে বেশ ভয় ভয় করছিল তার।

কাঞ্চন টিফিন-কেরিয়ারটা টেবিলের ওপর রেখে ক্লান্তগলায় বলল, সারা দুপুর অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম, পাওয়া গেল না। আজ রাত্রিটা তুমি এখানেই থাক। দেখি, কাল কি করে উঠতে পারি!

কাজল কাঞ্চনের ক্লান্ত মুখের দিকে তাকাল। কাঞ্চন আলনা থেকে গরম চাদরটা তুলে নিয়ে কয়েক পা দরজার দিকে এগিয়ে বলল, টিফিন-কেরিয়ারে খাবার আছে। খেয়ে নিও।

—আপনি খাবেন না?

—না। ভাল লাগছে না। তুমি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দাও। আমি যাচ্ছি—

—আপনি বাইরে যাচ্ছেন?

—বাইরে তো যেতেই হবে। একই ঘরে আমার সঙ্গে থাকতে তোমার আপত্তি আছে, জানি।

—আমার জন্যে আপনার খুবই অসুবিধে হচ্ছে!

—অসুবিধে?

ম্লান হেসে কাঞ্চন বলল, অসুবিধে হবার কিন্তু কথা নয়। এই বিরাট কলকাতা শহরে আমার মত সমস্যার মুখোমুখি আর কোন স্বামী হয়তো দাঁড়িয়ে নেই। এখন আর সুবিধে-অসুবিধের প্রশ্ন তুলে লাভ কি? তোমার কথা তো আমি মেনে নিয়েছি।

কাঞ্চন ঘর থেকে বেরিয়ে একতলায় নেমে এল। অবিনাশবাবুর দরজায় গিয়ে টোকা মারল। তিনিই এখন ওর একমাত্র ভরসা। অবিনাশবাবু রেডিও শুনছিলেন। টোকা শুনে দরজা খুলে সামনেই কাঞ্চনকে দেখে বললেন, ভায়া যে !

ভায়া সহজভাবে বলল, রাত্রের মত আপনার আশ্রয়ে এলাম।

বিস্ময়ের সুরে তিনি বললেন, কি রকম ! ঘরে তোমার সুন্দরী নবীনা স্ত্রী, আর তুমি কিনা আমার মত বুড়োর সঙ্গে রাত কাটাতে এলে ! ব্যাপারটা কি ?

কাঞ্চন মুখে হাসি টেনে বলল, গুরুতর কিছু নয়। সুন্দরী নবীনারাও তো সময় সময় নাগিণী হয়ে ওঠে। তখন একটু বেকায়দায় পড়ে যেতে হয়।

—অর্থাৎ ব্যাপার গুরুতর। নাগিণী ফোঁস করেছে ! কি নিয়ে বাঁধল ?

—আদর্শ।

—আদর্শ ?

আকাশ থেকে পড়লেন অবিনাশবাবু।

—আজকালকার ছেলেদের ওই এক রোগ বাপ্‌ ! বৌকে আদর্শ কি না বোঝালেই নয় ? আমাদের কালে তো আমরা ওপথ মাড়াতাম না ! বুঝলে ভায়া, পঁচিশটা বছর গিন্নির সঙ্গে কি গোলমাল করেই না কাটিয়েছি ! সে-সব ঝগড়ায় মাধুর্য ছিল। এস, ভেতরে এস। শুনি তোমাদের সমস্ত কথা।

কাঞ্চন ঘরের মধ্যে গেল।

একটানা কাঞ্চন ঘুমতে পারে নি। অবিনাশবাবুকে কল্পিত সরস কাহিনী শুনিয়েছে এগারোটা অবধি। তারপর তাঁর দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে এসেছে। প্রচণ্ড নাকের ডাকের মধ্যেও কাঞ্চন নানা কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘণ্টাখানেক পরেই ওর ঘুম ভেঙে গেল।

অবিনাশবাবুর পিলে চমকান নাকের ডাক তখনও অবিশ্রান্তভাবে চলেছে। কাঞ্চন চিন্তার তলহীন সমুদ্রে সাঁতারে বেড়াতে লাগল। কোথায় রাখা যায় কাজলকে ? এরকম ঘোরাল সমস্যার সমাধানের কথা ভাবতে হবে, দশ দিন আগেও কাঞ্চনের কল্পনার অতীত ছিল। অথচ····

হঠাৎ মান্নামাসির কথা মনে পড়ল।

প্রায় লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে কাঞ্চন উঠে দাঁড়াল। এখন একমাত্র মান্নামাসিই ওকে এই অসুবিধের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। কাঞ্চন ভালভাবেই জানে, অনুরোধ করলে তিনি ওর অনুরোধকে উপেক্ষা করবেন না।

মান্নামাসির পরিচয় এখানে দিয়ে রাখতে হয়।

কলকাতার বিশিষ্ট আধুনিক সমাজে মান্নামাসি একটি সুপরিচিতা নাম। তিনি সকলের মাসি। কিভাবে এবং কবে এই পদটি তিনি লাভ করেছিলেন তার ইতিহাস কারুর জানা নেই। বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। শরীরের যত্নাকৃত বাঁধুনী এবং কস্‌মেটিকের প্রলেপ ভেদ করে সঠিক বয়স আন্দাজ করা কষ্টকর। অবশ্য সাজে-পোশাকে তিনি নিজেকে তন্বী প্রমাণিতা করার জন্যে সবসময় সচেষ্ট।

মান্নামাসির একটি মেয়ে আছে। সুতপা। বয়স বছর পঁচিশ। উগ্র আধুনিকা। তার জন্মদাতাকে কেউ চেনে না। দেখে নি কোনদিন। অনেকের ধারণা ও-বস্তুটি মান্নামাসির কোনদিন ছিল না। বলাই বাহুল্য, এখন আর কারুর সুতপার জন্ম-ইতিহাস নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

মান্নামাসির আধুনিক ধাঁচের বাড়ি আছে। ফিফ্‌টি ওয়ান মডেলের হলেও একখানা গাড়ি আছে। আর্থিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল। এই স্বচ্ছলতার উৎস কোথায়, সকলেই জানেন। বয়স কালে মান্নামাসি মুঠো মুঠো টাকা রোজগার করেছেন নিজেকে বিলিয়ে। তা নিয়েও কারুর মাথাব্যথা নেই। সকলেই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

তাঁর মত করিতকর্মা মহিলা পাওয়া দুষ্কর। অমুকের সঙ্গে অমুকের প্রেম তেমন জমছে না, কিভাবে সেই কমজোর প্রেমকে জোরাল করা যায় তার পরামর্শ দেওয়া থেকে আরম্ভ করে, কোন্ পার্টিতে কি শাড়ি পরে গেলে কাকে কিরকম মানাবে তার সাজেশন দেওয়া অবধি, সমস্ত ব্যাপারেই তিনি সকলের পাশে পাশে আছেন।

এহেন মান্নামাসির সঙ্গে কাঞ্চনের পরিচয় হবার কথা নয়। উগ্র আধুনিকদের সোসাইটিতে কাঞ্চনের যাওয়া-আসা নেই। এমনকি এতদিন কলকাতায় আছে, সাধারণ কোন ক্লাবের সভ্য-তালিকাভুক্তও নিজেকে করতে

পারে নি। তাঁর সঙ্গে কাঞ্চনের আলাপ আকস্মিকভাবে হয়ে যায়।

মুখ বদলাবার জন্যে একদিন 'মোকাম্ব'য়ে গিয়েছিল। মান্নামাসিও কি কারণে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আলাপ হয়ে গেল। মান্নামাসি বাজিয়ে দেখলেন ছেলেটি বেশ শাঁসালো। স্বরূপ তো বটেই। কিছুদিন থেকে তিনি একটি ছেলের সন্ধানে আছেন। সুতপা কয়েকজনকে বেশ ভালই খেলিয়েছে। সারাটা জীবন এইভাবে চলবে না, মান্নামাসি বোঝেন। যৌবন ও চটক থাকতেই পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

সোসাইটিতে অবশ্য ছেলের অভাব নেই। মান্নামাসিকে শ্বাশুড়ী হিসেবে পেতে অনেকে পা বাড়িয়ে আছে। কিন্তু তাদের জামাই করতে তিনি ইচ্ছুক নন। অভিজ্ঞা মান্নামাসি জানেন, দামী দামী স্যুট পরে বেড়ালেও, নিজের দোষে ওই সমস্ত ছোকরারা নিজেদের ব্যাঙ্কের অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছে।

নিতান্ত সৌজন্যতার খাতিরেই যেন কাঞ্চনকে তিনি একদিন চায়ের টেবিলে আমন্ত্রণ জানালেন। আমন্ত্রণ এড়িয়ে যেতে পারে ভয় থাকায় নিজের ফিফ্‌টি ওয়ান মডেলের গাড়ি নিয়ে এসে ওকে তুলে নিয়ে গেলেন। আলাপ করিয়ে দিলেন সুতপার সঙ্গে। চায়ের টেবিলে সেদিন চা ছাড়াও আরো অনেক রকম মুখোরচক খাদ্য ছিল। বার বার অনুরুদ্ধ হয়ে প্রচুর খেল কাঞ্চন।

বিদায় নেবার সময় মান্নামাসি বললেন, এখানে একা থাক। কোনরকম অসুবিধেয় পড়লেই আমায় বলবে। লজ্জা কর না যেন !

কাঞ্চনকে মাঝে-মধ্যে মান্নামাসি সোসাইটির ফাংশনে নিয়ে গেছেন। ইঙ্গিতে সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আগামী দিনে কাঞ্চনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি হবে। যাকে নিয়ে এত কাণ্ড, তার কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। কাঞ্চন নিরাসক্তভাবে মান্নামাসি ও সুতপার সঙ্গে মেলা-মেশা করছে।

ভোর হয়ে গেলে কাঞ্চন অবিনাশবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তিনি তখনও সগর্জনে নিদ্রার কোলে ঢলে রয়েছেন। সিঁড়ির মুখে টেলিফোন ষ্ট্যাণ্ড। কাঞ্চন রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করল। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, মায়গ্রেসন সার্টিফিকেট এসে না পড়া পর্যন্ত মান্নামাসি কাজলকে নিজের কাছে রাখবেন।

কাঞ্চনের দুর্ভাগ্য, রিং করে মান্নামাসিকে পাওয়া গেল না। সুতপাকেও না। ওঁরা পুরী গেছেন। কাল ফিরবেন। এই কথা অপরপ্রান্ত থেকে মান্নামাসির চাকর জানাল।

নয়

আরেকদিন অবিনাশবাবুর ঘরে রাত কাটাল কাঞ্চন।

কাজলের সঙ্গে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দু-চারটে কথা ছাড়া আর কোন কথা হয় নি। হোটেল থেকে টিফিন-কেরিয়ার করে তার খাবার এনে দিয়ে অফিস গেল। কাজে মন বসাতে পারল না। আজ মান্নামাসি পুরী থেকে না ফিরে থাকলে অবিনাশবাবুর কাছে আবার নানারকম কৈফিয়ৎ দিয়ে রাতের মত মাথা গোঁজবার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া আরেকটা দিক আছে। কাজল ভাবতে পারে যে, ইচ্ছে করেই ও অন্যত্র তার থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে না।

বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে কাঞ্চন মান্নামাসির বাড়ি গেল। সকন্যা মান্নামাসি সকালেই ফিরেছিলেন পুরী থেকে। কাঞ্চনকে দেখে আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠলেন।

বললেন, এস এস। আজই পুরী থেকে ফিরেছি।

—গতকাল ফোন করে জানতে পেরেছিলাম আপনারা পুরী গেছেন।

—কি চমৎকারভাবে যে আমাদের দিনগুলো পুরীতে কাটল তোমায় কি বলব কাঞ্চন! সানরাইজ আর সানসেট দুটোই সপ্লেনডিড!

—আমিও গিয়েছি পুরী। খুব ভিড় না থাকলে ভালই লাগে।

—ভিড় ছিল না বিশেষ। আমার এন্টায়ার একটা বাড়ি পেয়ে গিয়েছিলাম।

সুতপা ঘরে এল।

বয়সের দীর্ঘ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মা ও মেয়ের সাজ-পোশাকে কোন তারতম্য নেই। মান্নামাসির পরনে ওয়ালনাট কালারের ডেক্রনের শাড়ি।

এই শীতেও স্লিভলেশ ব্লাউজ। নিরাভরণ দুটি হাত। বিরাট লকেটযুক্ত সরু চেন গলায়। কানে উজ্জ্বল দ্যুতিযুক্ত টপ। মসীকৃষ্ণ গায়ের রঙকে আপ্রাণভাবে চেপে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে—তবে ম্যাক্স ফ্যাক্টারের পুরু পর্দা ভেদ করে কিছু রঙয়ের জেল্লা ফুটে বেরুচ্ছে।

সুতপার সাজ-পোষাকও ওই একই ধরনের। শাড়ীর রঙ শুধু ওয়াল-নাটের জায়গায় সলোমন পিঙ্ক। গায়ের রঙই যে শুধু চাপা তাই নয়, মুখ-চোখেও তেমন ধার নেই। সাজের চটকের জন্যে প্রথম নজরে অবশ্য খারাপ লাগে না।

সুতপা বলল, আচ্ছা মানুষ যাহোক আপনি! পুরী যাওয়ার আগে কত খোঁজ করলাম। কোথায় ছিলেন?

—বাড়ি গিয়েছিলাম।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে মান্নামাসি বললেন, সুপা, আর দাঁড়িয়ে থেকো না। বেয়ারাকে গিয়ে বল কাঞ্চনের জন্য চা আনতে।

চা এল। ওই সঙ্গে কিছু খাদ্যবস্তুও এল।

চা খেতে খেতে কাঞ্চন নিজের কথা পাড়ল।

—আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম মাসিমা।

—কি কথা?

কাঞ্চনের প্রতিটি কথা শোনার মত ধৈর্য ও উৎসাহ মান্নামাসির আছে।

ইতস্তত করে কাঞ্চন বলল, আপনার সাহায্য আমার প্রয়োজন।

—সাহায্য?

—মানে…এক মহিলাকে কয়েকদিনের জন্যে নিজের বাড়িতে স্থান দিতে হবে। অবশ্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি তার জন্যে অন্যত্র অ্যাকমডেসন খুঁজে নেব।

মান্নামাসির মনে সন্দেহের ছায়া নামল। মেয়ে!

—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! কে মেয়েটি—কার কথা বলছ?

কাঞ্চন সঙ্কোচকে জয় করল।

পরিষ্কার গলায় বলল, আমার স্ত্রীর কথা বলছিলাম।

—স্ত্রী!

মা ও মেয়ে দুজনেই যেন কাঞ্চনজঙ্ঘার চুড়া থেকে ছিটকে পড়লেন।

—তুমি বিয়ে করেছ! কবে?

—দিন কয়েক আগে।

বিমর্ষভাবে মান্নামাসি বললেন, আমরা তো কিছুই জানি না! আমাদের বাদ দিয়ে কাজটা সেরে ফেললে?

—তা নয়। আমি নিজেই জানতাম না আমার বিয়ে। অবস্থা বিপাকে পড়ে বিয়েটা করে ফেলতে হল। মেয়েটি বাঙালী নয়।

আরেক দফা বিস্মিত হবার পালা।

বিয়ের সংবাদ শুনে সুতপার মুখে এক পোঁচ কালি পড়ে গিয়েছিল। ঈর্ষায় জ্বলে যাচ্ছিল তার বুক।

মান্নামাসি সতর্কতার সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, বাঙালী নয়?

—না। বেহারী। আমাদের পরিচিত এক বেহারী ভদ্রলোকের মেয়ে।

কাঞ্চন ওর বিয়ের ইতিহাস সংক্ষেপে বলল। শুধু বলল না ওদের দুজনের সম্পর্কের কথা। শেষে জানাল, ঘরখানা ওর অত্যন্ত ছোট। কিচেন নেই। সুতরাং ভাল ফ্ল্যাট না পাওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে এখানে রাখতে চায়।

চরম হতাশার মধ্যে ক্ষীণ আলোর সন্ধান পেলেন মান্নামাসি। মেয়েটি বাঙালী নয় এবং অবস্থা বিপাকে বিয়ে হয়েছে, এই সংবাদ দুটি অত্যন্ত মূল্যবান। বললেন, আমি তো ভাবতেই পারছি না। তোমার মত কাল্‌চার্ড বয়, সে কিনা একটা আন্‌কাল্‌চার্ড বেহারী মেয়েকে,— সেকেলে ছেলেদের মত মায়ের আদেশ সুবোধ বালকের মত মেনে নিলে?

কাঞ্চন সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সে গ্র্যাজুয়েট। সুশ্রী দেখতে। ভাল পরিবারের মেয়ে।

—তাই নাকি। টেনে টেনে মান্নামাসি বললেন, খুশি হলাম শুনে। এবার সকলকে ইন্‌ভাইট করে ককটেল দাও। তোমার বিয়ের আনন্দ ওইভাবে উপভোগ করি।

—খুশি যে হন নি, বুঝতেই পারছি। চললাম।

—চললে মানে। তোমার বৌকে কখন রেখে যাচ্ছ বল? তোমার বৌ কয়েকদিন আমার কাছে থাকবে এতো সুখের কথা।

কাঞ্চন একটু থেমে বলল, কাল সকালে নিয়ে আসব। এখন চলি

কাঞ্চন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ভয় ভয় করে কাজলের। অজানা জায়গায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা একলা রয়েছে। সেই কখন কাঞ্চন বেরিয়ে গেছে। কখন ফিরবে কে জানে! ফিরে এসেই টিফিন-কেবিয়ার নিয়ে আবার ছুটবে। হোটেল থেকে খাবার নিয়ে আসবে। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলেই কাঞ্চন বেরিয়ে যাবে। কোথায় রাত কাটায় কে জানে! এব ভীতিপ্রদ বন্দী জীবন কাজলের ভাল লাগে না।

বলতে গেলে দুদিনেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেও উপায় নেই। এমন কি এর জন্যে কাঞ্চনকেও দায়ী করা যায় না। স্বেচ্ছায় সে এসেছে এখানে। এখন এম এ.-তে অ্যাডমিশন হয়ে গেলেই বাঁচে এবং ওই সঙ্গে হোষ্টেলে থাকার জায়গা।

মান্নামাসির ওখান থেকে সাড়ে সাতটার পর কাঞ্চন ফিরল। ওকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। টিফিন-কেরিয়ারটা একপাশে রাখা ছিল। ওটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, তোমার থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

—কোথায়?

—আমার এক পরিচিতা মহিলা আছেন, তাঁর বাড়িতে। সেখানে তোমার কোনরকম অসুবিধে হবে না। তবে তোমায় একটা কথা রাখতে হবে।

—বলুন?

—আমি বলেছি এখানে কিচেন নেই, ঘর ছোট, তাই তুমি ওখানে গিয়ে থাকবে। ভাল ফ্ল্যাট পেলে আমি তোমাকে নিয়ে আসব। আমাদের মধ্যেকার সম্পর্কের কথা তুমি ওদের বলবে না।

—বেশ।

—কাল থেকে তোমাকে আর কষ্টভোগ করতে হবে না।

—আপনার অসুবিধেও দূর হবে।

কাঞ্চন ও-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, তোমার বোধহয় খিদে পেয়ে গেছে। আমি খাবার আনতে চললাম।

যাওয়া আর হল না। অভাবনীয়ভাবে সকন্যা মান্নামাসির আবির্ভাব ঘটল। কাঞ্চন অবাক। তাঁরা এখানে আসতে পারেন, এ ধারণা ওর ছিল না।

মান্নামাসি বললেন, কাঞ্চন, তোমার বৌ দেখতে এলাম।

কাঞ্চন নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আপনি এসময় আসবেন ভাবি নি।

—অন্যত্র প্রোগ্রাম ছিল। প্রোগ্রাম ক্যানসেল করে চলে এলাম। এই মেয়েটি নিশ্চয়ই ?

কাঞ্চন পরিচয় করিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল, আমার স্ত্রী কাজল। আর ইনি মান্নামাসি—যাঁর কথা একটু আগে তোমায় বলছিলাম। এঁর কাছেই তুমি থাকবে। আর উনি সুতপা দেবী।

প্রথম দর্শনেই মান্নামাসি ও সুতপাকে ভাল লাগল না কাজলের। তার মনে হতে লাগল, দুজন পুরুষ যেন নিজেদের শাড়ির আবরণে মুড়ে নিয়ে এসেছে। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

সুতপা বলল, আপনি বলেছিলেন না, আপনার স্ত্রী শিক্ষিতা ? কিন্তু শিক্ষা ও ভব্যতার কোন পরিচয় তো পাচ্ছি না! হাত তুলে নমস্কার করার সৌজন্যতাটুকুও ওঁর জানা নেই দেখছি!

—কি যে বল—মান্নামাসি বললেন, এতসব যদি জানবেই তাহলে আর····

ইচ্ছে করেই কথাটা শেষ করলেন না তিনি।

কাজলের মুখের রঙ পাল্টাল।

কাঞ্চনের সমস্ত মন বিরক্তিতে তেতো হয়ে উঠল। তবুও যথাসম্ভব সহজভাবেই বলল, আপনারা দাঁড়িয়ে কেন ? বসুন!

—না, আর বসব না। বৌ দেখা হল। এবার যাই।

—মা, ফর্দটা দিয়ে যাবে না ?

—ও, হ্যাঁ—হ্যাঁ, ফর্দটা দিয়ে যেতে হবে। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

কাঞ্চন প্রশ্ন করল, কিসের ফর্দ ?

হাসলেন মান্নামাসি। বেশ মিষ্টি করেই হাসলেন।

—আমি জানি, ঘর ছোট আর কিচেন নেই; এই অজুহাত দেখিয়ে তুমি কেন আমার কাছে একে রাখতে চাইছ। শুধু শাড়ির পুঁটলি সারাজীবন ঘাড়ে করে বয়ে বেড়ান খুবই কষ্টকর। তুমি কিছু ভেব না। আমি শিখিয়ে-

পড়িয়ে ঠিক একে আধুনিকা করে তুলব। সোসাইটিতে হৈ-চৈ লাগিয়ে দেবে এ মেয়ে।

—কিন্তু ফর্দটা কিসের, এখনও আমি বুঝতে পারি নি?

—ফর্দটা হল আনুষঙ্গিক কিছু জিনিসপত্তরের। তোমার বৌকে আধুনিকা করতে গেলে ওগুলো দরকার হবে। ভাল কথা, ক-টার সময় কাল আমার এখানে আসছো?

—অফিসে যাবার পথে কাজলকে আপনার ওখানে পৌঁছে দেব।

—বেশ।

সকন্যা মান্নামাসি বিদায় নিলেন। নীরবে কাটল কয়েক মিনিট।

তারপর কাজল বলল, এইতো আপনাদের ভদ্রতা, শালীনতা আর শিক্ষার গুণ!

—সব মানুষ এক ধরনের হয় না। দু-চারজনের ব্যবহার দেখে তুমি সকলকে দোষী করতে পার না।

—দু-চারজন! এই ক-দিনের মধ্যে আপনাদের যত জনকে দেখলাম, প্রত্যেকের ওই এক ভাব। দম্ভ আর পরকে উপেক্ষা করার মনোভাব। বলতে পারেন, কি অপরাধ আমার? কেন ওঁরা আমাকে অপমান করে গেলেন?

কাঞ্চন মৃদুগলায় বলল, স্বীকার করছি, ওঁদের ব্যবহার ভদ্রোচিত হয় নি। তুমি এ ধারণা কর না, ওঁদের কথায় আমার সমর্থন আছে। তবু মান্নামাসি ও সুতপার হয়ে আমি তোমার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

—ক-জনের হয়ে ক্ষমা চাইবেন? আপনার বোন, আপনার পিসি, এঁদের ব্যবহারের কথাও তো আপনার অজানা নেই!

—কৃষ্ণা, পিসিমা, মান্নামাসি, সুতপার কথা তুমি বড় করে দেখলে, আমার মা-বাবা এঁদের মিষ্টি ব্যবহার, এঁদের উদারতা তোমার মনে দাগ কাটল না? প্রত্যেক সমাজে কৃষ্ণার মত মানুষ আছে। তারা জল ঘোলা করতেই বোধহয় পৃথিবীতে আসে। তোমাদের সমাজেও আছে। যাক, ওকথা। কাল তোমায় যেতে হবে, কাপড়-চোপড় এইবেলা গুছিয়ে নাও।

—আমি ওঁদের ওখানে যাব না।

—যাবে না!

—না।

কাঞ্চনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আনন্দের ঝঙ্কার উঠল যেন।

—তোমার কত অসুবিধে হচ্ছে এখানে!

—কোন অসুবিধে হচ্ছে না আমার। অসুবিধে হচ্ছে আপনার। আমার জন্যে যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন এখানে-ওখানে।

কাঞ্চন কাজলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমিই তো আমাকে যাযাবর করে তুলেছো।

—সমস্ত অশান্তির মূলে আমি। আপনার শান্তিময় জীবনকে বিঘ্নিত করে তুলেছি। আরেকটা চৌকি আনিয়ে নিন। আজ থেকে ঘরেই শোবেন। আপনার উপর পূর্ণ বিশ্বাস আমার আছে।

—অস্বোয়াস্তি বাড়িও না। মুখে বলছো বটে পূর্ণ বিশ্বাস আছে, আমি জানি সমস্ত রাত তুমি ঘুমবে না। আমিও বিছানায় এপাশ-ওপাশ করব। কি দরকার? দিন তো চলেই যাচ্ছে। আর ক-দিনই বা লাগবে তোমার মায়গ্রেসন সার্টিফিকেটটা এসে পড়তে!

কাঞ্চনের সৌভাগ্য বলতে হবে, পরের দিনই অবিনাশবাবু জানালেন, তেতলার সেই ফ্ল্যাট খালি হয়েছে। ভাড়াটে ভদ্রলোক দিল্লী রওনা হয়ে গেছেন। কাঞ্চন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সময় নষ্ট না করে চলে এল নতুন ফ্ল্যাটে। ঘরগুলো ভালো। বড় বড় জানলা আছে। কাজল জিনিসপত্তর গুছিয়ে রাখল। এ ব্যবস্থায় সে খুশি হয়েছে। তার জন্যে কাঞ্চন প্রতি রাত্রে ঘরছাড়া হচ্ছিল। এখন আর কোন সমস্যা রইল না। দুটো শোবার ঘর, আর একটা বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করলেই চলবে।

একটা তক্তপোশ ছিলই, আরেকখানা আনান হল। তাছাড়া মাসিক ভাড়ায় ড্রইং-রুম সেট আনাল কাঞ্চন বসবার ঘরের জন্য। টেবিল ট্রান্‌জিষ্টারও। পড়াশোনা ছাড়া বাকি সময় কাটাবার জন্যে কাজলের কিছু চাই। গান শুনে সেই সময়টুকু কাটাতে পারবে। গোছগাছ সারতেই বিকেল হয়ে গেল। কাঞ্চন আজ আর অফিস যায় নি।

—যাক্, বড় রকম একটা প্রব্‌লেম সল্‌ভ হল। তুমি এখন স্বচ্ছন্দে পড়াশোনা আরম্ভ করতে পার।

—ওঁদের একটা সংবাদ পাঠিয়ে দিলে হত না?

—কার কথা বলছো?

—ওই ভদ্রমহিলাদের কথা বলছিলাম। আজ থেকে তো ওঁদের ওখানে আমার থাকবার কথা। আমি যাব না, এ কথাটা জানিয়ে দেওয়া ভাল না?

—ঠিক বলেছো। আমার মনেই ছিল না। সংবাদ দিয়ে দেওয়া দরকার বৈকি! ফোনে বলে দিচ্ছি মান্নামাসিকে। ভাল কথা, তুমি কিসে পরীক্ষা দিতে চাও?

—পলিটিক্সে।

—কি বই-টই লাগবে আমায় বল। এনে দেব।

কাজল শান্তগলায় বলল, আগে অ্যাডমিশন হোক, তারপর।

—বেশ।

মান্নামাসিকে ফোন করবার জন্যে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কাজল আবার বলল, একটা কথা বলছিলাম—

—বল?

—হোটেলের খাবার খেতে আমি অভ্যস্ত নই। গা ঘিন ঘিন করে।

—উপায় তো কিছু নেই। খাওয়া-দাওয়া তো কোথাও করতেই হবে!

—এ ফ্ল্যাটে তো রান্নাঘর রয়েছে। রান্না যদি আমিই করি—

—তুমি! তুমি রান্না করবে?

—দুজনের রান্না রাঁধতে আমার অসুবিধে হবে না।

কাঞ্চনের মন পাখা বিস্তার করে দূরান্তরে উড়ে যেতে চাইল। কাজল ওকে রান্না করে খাওয়াবে! নিয়মিত!

—বেশ তো, তোমার যদি অসুবিধে না হয় আমি আপত্তি করব কেন? বাসনপত্তর আমার কাছে কিছুই নেই। ওগুলো কিনে আনতে হয় তাহলে। তুমি একটা লিষ্ট তৈরী কর। আমি মান্নামাসিকে ফোন করে আসছি।

এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সে-বেলায় আর রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করা গেল না। তৈজসপত্তর কিনতে-কাটতেই ন-টা বেজে গেল। পরের দিন সকালে রান্না করল কাজল। মোটা-মুটি ভালই রাঁধল। কাঞ্চন নীরবে খাওয়া শেষ করল। রুদ্ধ আগ্রহে অপেক্ষা করছিল কাজল, যদি রান্না সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করে কাঞ্চন।

তাকে কিছু না বলতে দেখে, শেষে কাজল নিজেই বলল, আমাকে মা উনুনের কাছে কখনও যেতে দেন নি। আমি রান্নাবান্না তেমন জানি না। বোধহয়····

—না না, রান্না বেশ ভালই হয়েছে।

দশ

দিন দশেক কেটে গেল।

কাঞ্চন নিয়মিত অফিসে যাওয়া-আসা করে। অফিস থেকে ফিরে আবার কোথায় যায়। কাজল আগেকার মত নির্বিকার আছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলে না। এখনও পাটনা থেকে মায়গ্রেসন সার্টিফিকেট আসে নি। এক এক সময় মনে হচ্ছে, নিজে না গেলে সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে না।

এদিকে সময় কাটতে চাইছে না। কত রেডিও শুনবে? যে ষ্টেশনই খোল, সিনেমার গানের প্রোগ্রামই যেন বেশি। একঘেয়ে সিনেমার গান মানুষের কত ভাল লাগতে পারে? কাঞ্চন প্রায় এক বোঝা হিন্দী উপন্যাস কিনে এনে দিয়েছে। কয়েক পাতা পড়ে আর এগোতে পারে না কাজল। ভাল লাগে না। অবাক হয়ে ভাবে, মানুষ পয়সা খরচ করে এই সমস্ত উপন্যাস কেনে! লাইব্রেরীতে লাইব্রেরীতে যায়—আশ্চর্য!

সারাক্ষণ মাথা ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। অসংখ্য চিন্তা কাজলকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এক এক সময় কান্না পেয়ে যায়। মনোরমা ও হরিদয়ালের উপর তীব্র অভিমানে নুয়ে পড়ে মন। তার জীবনের সমস্ত শখ, আহ্লাদ ছত্রখান হয়ে গেল।

নিজেকে অন্যমনস্ক করার জন্যে মাঝে মাঝে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। উঁচু থেকে নিচেকার বস্তিটা খেলাঘরের বাড়ির মত মনে হয়। কল-কারখানার কুলী-মজুররা ওখানে থাকে। কত অভাব-অভিযোগ ওদের। কাজল উপর থেকে দেখতে পায়, কলের জল নিয়ে মেয়েতে মেয়েতে কথা কাটাকাটি হচ্ছে। মাতাল স্বামী ঘর থেকে স্ত্রীকে বাইরে টেনে এনে নির্দয়ভাবে মারছে। ভীড় জমে যাচ্ছে চারধারে। লোকে টিটকিরি দিচ্ছে কদর্য ভাষায়।

তবু ওরা সুখী। কাজল চিন্তা করে দেখেছে, অভাব-অভিযোগ, ঋণ ও নোংরামির মধ্যে থেকেও সুখী। ওদের জীবনধারার সুষ্ঠপথ নির্ধারিত আছে। কিন্তু...

কাজল ভাবে আর তাকিয়ে থাকে

কাঞ্চন অফিস থেকে ফিরে ওপরে উঠে যাচ্ছিল, অবিনাশবাবুর আহ্বানে থামল। নেমে এল সিঁড়ির কয়েক ধাপ। অবিনাশবাবু নিজের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নিজের চকচকে টাকের ওপরে সস্নেহে হাত বোলাতে বোলাতে তিনি এগিয়ে এলেন।

—চুপিচুপি পালিয়ে যাচ্ছিলে যে ?

সহাস্যে কাঞ্চন বলল, চুপিচুপি আবার কোথায় ? আমার পায়ের শব্দ মোড়ের মাথা থেকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

—যাচ্ছে হয়তো ! বয়স হয়ে গেল, কানেও হয়তো কম শুনছি। নতুন ফ্ল্যাটে যাওয়ার পর থেকে তো তোমার আর টিকি দেখা যাচ্ছে না। ঝগড়া অন্তে গিন্নীর সঙ্গে প্রেম বেশ জমেছে বল ?

—কই আর জমল ! মাঝখানে এখনও হাইফেন রয়েছে।

—হাইফেন !

—সেই আদর্শ।

অবিনাশবাবু অনুচ্চ গলায় হেসে বললেন, আদর্শকে চুলন্দোরে পাঠাও। বৌয়ের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করার এই হল সময়। এখন আদর্শ নিয়ে ব্যস্ত থাকলে ঠকতে হবে ভায়া। এই অভিজ্ঞ বুড়োর কথা শোন, ওবিডিয়াণ্ট

সারভেণ্ট হয়ে যাও। অনাবিল আনন্দ পাবে। তবে হ্যাঁ, বয়সকালে লাগাম টেনে ধরতে হবে।

—আপনিও তাই করেছিলেন নাকি ?

—করেছিলাম বৈকি ! আজকালকার মেয়েদের সামলান তো কিছুই নয়। সেই নথ নেড়ে নেড়ে মুখ ঝামটা যদি খেতে, বুঝতাম। সেই দাপটকে আমি সামলেছি। আমার বুকের পাটাখানার কথা একবার চিন্তা কর !

—আপনার উপদেশ আমার মনে থাকবে।

—আর একটা কথা বলি, শোন। শ্রীমতীকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখো না। মন-মেজাজ বোধহয় তাই এত বিগড়ে গেছে। থিয়েটার-বায়স্কোপে নিয়ে যাও। কলকাতার দ্রষ্টব্যগুলো দেখাও, তা নয়—

কাঞ্চন উৎসাহের সঙ্গে বলল, ঠিক বলেছেন। আমার আগেই ওকে নিয়ে বেরুন উচিত ছিল।

—আমি বেঠিক কখনও বলি না। চললে কোথায় ?

কয়েক ধাপ ওপরে উঠে গিয়েছিল কাঞ্চন।

—ওপরে।

—সন্ধির সূত্র যেই বলে দিলাম, অমনি ওপরে। আমার মিষ্টি কি হল ?

—মিষ্টি ! ও, হ্যাঁ। মনে আছে। রবিবার দিন দেখা যাবে কত মিষ্টি আপনি খেতে পারেন !

কাঞ্চন ওপরে উঠে গেল।

দরজায় করাঘাত করতেই কাজল দরজা খুলে দিল। তার সাজ-পোশাকে কোন পারিপাট্য নেই। বিমর্ষ মুখ। প্রত্যহ অফিস থেকে ফিরে এই একই-ভাবে কাজলকে দেখতে পায় কাঞ্চন। ইচ্ছে করে, বলে, একটু পরিপাটি হয়ে থাকলে তো পার। নিজের সৌন্দর্যের ওপর এত নির্মম হচ্ছো কেন ?

ঘরে পা দিয়ে কাঞ্চন বলল, তুমি আগে কখনও কলকাতা এসেছিলে ?

—না।

—এখানকার কিছুই তাহলে তোমার দেখা নেই ?

—না।

—চল না, আমরা কোথাও ঘুরে আসি !

কাজল টেবিলের দিকে তাকিয়ে ছিল। সেই দিকে তাকিয়েই বলল, একথা কেন বলছেন?

—কেন আবার, এমনি! দিনের পর দিন এই চার দেয়ালের মধ্যে রয়েছো। হাঁপিয়ে ওঠা বিচিত্র নয়। কোথাও ঘুরে এলে মন প্রফুল্ল হবে।

—আপনি অনর্থক এই সমস্ত নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। আমার মনকে প্রফুল্ল করার চেষ্টা নাইবা করলেন! আমি বেশ আছি।

কাঞ্চন নিভে গেল। অসহ্য বিরক্তিতে মনের মধ্যেটা তোলপাড় করে উঠল। কাজলকে পাশ কাটিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। দরজার কাছে পেঁৗছে ঘুরে দাঁড়াল সে।

অনভ্যস্ত তীক্ষ্ণগলায় বলল, তুমি যখন আমার কাছে আছো তখন তোমার ভাল-মন্দ দেখা আমার কর্তব্য। আমি তোমার কাছে কোন বদ্‌প্রস্তাব করি নি। নির্বিচারে আমি তোমার প্রতিটি কথা রাখতে পারছি, আর তুমি আমার সামান্য একটা কথা রাখতে পারলে না। অনিচ্ছা থাকলেও অনেক সময় মানুষ ভদ্রতা বজায় রাখে। ভুল আমারই। ছি-ছি-ছি, কেন তোমায় অনুরোধ করতে গেলাম!

উত্তরের অপেক্ষা না করে সে নিজের ঘরে চলে গেল।

মিনিট পনেরো কেটেছে বোধহয়। কাজল এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। কাঞ্চন জামা-কাপড় না বদলেই জুতোসমেত বিছানায় শুয়ে ছিল চিৎ হয়ে।

—শুনছেন—

কাঞ্চন উঠে বসল।

—কিছু বলবে?

—দোষ আমারই। রূঢ়ভাবে আপনাকে কথাটা বলা আমার উচিত হয় নি। আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন বলছিলেন—

কাঞ্চন স্ত্রীর দিকে তাকাল। কাজল নিজেকে বাইরে যাবার উপযোগী করে নিয়ে এসেছে। কচি কলাপাতা রঙয়ের শাড়ির সঙ্গে ওই রঙেরই ব্লাউজ পরেছে। চুলের ভারে খোঁপা ভেঙে পড়ছে পিঠের ওপর। মুখে হাল্কা পাউডারের প্রলেপ। এই অল্প সাজেই তাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। সে চেষ্টা করেও চোখ ফিরিয়ে নিতে পারল না।

তারপর কতক্ষণ পরে প্রশ্ন করল, কি বলছিলে ?

—আপনি বলছিলেন আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন !

—আজ থাক।

ভোর থেকে বৃষ্টি আরম্ভ হল। অকাল বর্ষণ। ঝিমিয়ে পড়া শীত বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় চাঙ্গা হয়ে উঠল। ঝিরঝির করে বিরক্তিকর বৃষ্টি চলল সমস্ত দুপুর।

কাঞ্চন ভিজতে ভিজতেই অফিস গেছে। কাজল ভেবে পায় না, এত ভাল যখন চাকরি করে, ওর তো কোম্পানি থেকে গাড়ি পাবার কথা। গাড়ি পায় নি কেন কে জানে! গাড়ি থাকলে এত কষ্ট করে অফিস যেতে হয় না।

কাজল জানলার ধারে দাঁড়িয়ে নিচের বস্তিটার দিকে তাকাল, বৃষ্টি হতে থাকায় প্রচণ্ড অসুবিধেয় পড়েছে ওরা। কিন্তু অসুবিধেকে প্রকট হতে দিচ্ছে না। চেষ্টা করে যাচ্ছে সাধ্যমত স্বাভাবিকভাবে কাজ-কর্ম করতে।

অন্যান্য দিনের চেয়ে কাঞ্চন আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল। ভিজে ঢোল হয়ে গেছে। নিজের ঘরে গিয়ে জামা কাপড় বদলে বসবার ঘরের সোফায় এসে বসল।

কাজল জলখাবার নিয়ে এল। পুরু মাখন লাগান চার স্লাইজ টোষ্ট, ডিম সিদ্ধ আর কফি। ন-টার সময় রাত্রের খাওয়া শেষ করে নেয় বলে অফিস থেকে ফিরে এর চেয়ে ভারি কিছু খায় না কাঞ্চন।

কাঞ্চন সিগারেট ধরিয়ে জ্বলন্ত কাঠি অ্যাসট্রেতে ফেলতে ফেলতে বলল, খাব না।

—খাবেন না !

—খেতে ভাল লাগছে না। শরীর কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে। অসুবিধে না হলে আদা দিয়ে এক কাপ গরম জল করে এনে দাও।

কাজল খাবারের প্লেট আর কফির কাপ তুলে নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আদা দিয়ে এক কাপ গরম জল নিয়ে এল। জলটা খেয়ে সে নিজের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে অবিনাশবাবুর কাছে গেল।

পরের দিন। অফিস যাওয়ার সময় কাঞ্চন নামমাত্র খেল। শরীর খুব ভাল বোধ করছে না। জ্বর আসলেই চিন্তির।

ইতস্তত করে কাজল বলল, আজ অফিস নাইবা গেলেন!

— না গেলে গোটাকয়েক জরুরী কাজ আটকে যাবে। দেখি, তাড়াতাড়ি যদি ফিরতে পারি!

তাড়াতাড়ি অফিস থেকে কাঞ্চন ফিরতে পারে নি। কাজলকে উৎকণ্ঠা ঘিরে রেখেছে। ফিরতে দেরী হচ্ছে কেন? অফিসে কি শরীর বেশি খারাপ হল? আবার মনকে বোঝাবার চেষ্টা করছে, তার এত উৎকণ্ঠা কেন? যে লোকটার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না, তার শরীর খারাপ হলেই বা কি!

এই যুক্তির স্বপক্ষে মনের মধ্যে কি জোর পাচ্ছে?

অন্যান্য দিনের চেয়ে ঘণ্টাখানেক পরেই কাঞ্চন অফিস থেকে ফিরল। কোন কথা না বলে নিজের ঘরে চলে গেল। কাজলের মনে হল, ও যেন টলছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও সে যখন বসার ঘরে এল না, জলখাবারের প্লেট হাতে নিয়ে কাজল দ্বিধাজড়িত পায়ে এ-ঘরে এল।

কাঞ্চন বিছানায় শুয়ে ছিল। কাজলের দিকে তাকিয়ে বলল, কিছু খাব না। শরীর খুব খারাপ।

কাজলের বুকের মধ্যে রক্ত ছলাৎ করে উঠল।

তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কাঞ্চন আবার বলল, অফিসে যাওয়ার পরই শরীর বেশ খারাপ হয়ে পড়েছিল। এখন চেপে জ্বর এসেছে।

কাজল ফিরে এল। জ্বর এসেছে কাঞ্চনের। এখন সে কি করবে? ডাক্তারকে কল দেওয়া উচিত। কিন্তু কলকাতার পথ-ঘাট সম্বন্ধে তো তার কোন জ্ঞানই নেই। কোথায় খুঁজতে যাবে ডাক্তারকে? নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে লাগল।

হঠাৎ অবিনাশবাবুর কথা মনে পড়ল। বাড়িওয়ালার সঙ্গে কাঞ্চনের হৃদ্যতা আছে সে জানে। তাঁকে খবর পাঠালে ভাল হয়। তিনি ডাক্তার ডেকে আনতে পারেন। আশু চিকিৎসার ব্যবস্থা হতে কোন অসুবিধেই হবে না।

কাজল ঝিয়ের অপেক্ষায় রইল। ঠিকে-ঝি সকালে কাজ করে গেছে। আবার সন্ধ্যার পর আসবে। ঝি আসতেই তাকে অবিনাশবাবুর কাছে কাজল

পাঠাল। কাঞ্চনের অসুখের সংবাদ পেয়ে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে অবিনাশবাবু এলেন। কাজল আড়ালে রইল। ঝি তাঁকে নিয়ে গেল কাঞ্চনের ঘরে।

অবিনাশবাবুকে দেখে বেশ অবাক হল কাঞ্চন।

—আপনি ?

—শুনলাম, তোমার শরীর খারাপ হয়েছে ?

—জ্বর হয়েছে। আপনাকে খবর দিল কে ?

মৃদু হেসে অবিনাশবাবু বললেন, ঘরে তোমার উৎকণ্ঠিতা ভার্যা। খবর পেতে কি আর বিলম্ব হয় ভায়া !

তিনি কাঞ্চনের কপালে হাত দিলেন।

—হুঁ, বেশ জ্বর। আমি এখুনি ডাক্তার সোমকে ডেকে আনছি।

সে আপত্তি তুলল।

—আপনি মিথ্যে ব্যস্ত হচ্ছেন। বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর এসেছে। দিন দুয়েক ভুগিয়ে নিজেই সরে পড়বে।

—সময় খুব খারাপ। চতুর্দিকে নিউমোনিয়ার হিড়িক পড়ে গেছে। ডাঃ সোমকে দেখিয়ে নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

ডাঃ সোম এলেন।

রুগীকে পরীক্ষা করে বললেন, ভয়ের কিছু নেই। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে। প্রেসক্রিপ্সন করে দিচ্ছি, ওষুধ আনিয়ে নিন। তিন ঘণ্টা অন্তর একদাগ করে খাওয়াবেন। ঘুমিয়ে পড়লে ডেকে খাওয়াবার দরকার নেই।

ওষুধ আনিয়ে এক দাগ খাইয়ে অবিনাশবাবু বিদায় নিলেন দশটার সময়।

রাত বাড়ছে। কাজলের চোখে ঘুম নেই।

বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছে। ঘুমুতে ভয় করছে। যদি কাঞ্চন ডাকে। যদি কিছু ওর প্রয়োজন হয়। ডাক্তার যদিও বলে গেলেন ভয়ের কিছু নেই। তবু মন থেকে ভয় দূর হচ্ছে না। ঘুরে-ফিরে মনে পড়ছে অবিনাশবাবুর কথা। আড়াল থেকে শুনেছে, তিনি বলছিলেন, চারদিকে খুব নিউমোনিয়া হচ্ছে।

কাঞ্চনের যদি নিউমোনিয়া হয়—না, ও-সমস্ত কথাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতেই হবে। আরো অনেক সময় কাটল। দেয়াল ঘড়িতে হুটো বাজল সশব্দে।

বিছানা থেকে নামল কাজল। আজ হুটো ঘরের মধ্যেকার দরজা খোলা রয়েছে। লঘুপায়ে এ-ঘরে এল। এক অজানা আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে এল কাঞ্চনের বিছানার পাশে। বেডরুম ল্যাম্পের হাল্কা আলোয় কাজল দেখল, কাঞ্চন ঘুমচ্ছে। গায়ের র‍্যাগটা মেঝেতে পড়ে গেছে। অনাবৃত শরীর।

কাজল ওর মুখের দিকে তাকাল পূর্ণদৃষ্টিতে। এতদিন একসঙ্গে বাস করলেও কখনও কাঞ্চনের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে নি। এখন এই আবছা আলোয় ওকে খুঁটিয়ে দেখল। দীর্ঘ সুঠাম দেহ, দীঘল নাসা, সুশ্রী মুখ, একমাথা ঘন চুল—

কাজল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

মেঝে থেকে র‍্যাগটা তুলে নিয়ে সন্তর্পণে গায়ে দিয়ে দিল। জ্বর কি এখন বেশি? অনেক ইতস্তত করে, অনেক সাহস সঞ্চয় করে কাজল কাঞ্চনের কপালে হাত দিল। জ্বর নেই। বিন্দু বিন্দু ঘাম সারা কপালে ফুটে রয়েছে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেছে। ভালই হল। হাতটা কিন্তু সরিয়ে নেবার অবসর পেল না সে, কাঞ্চনের ঘুম ভেঙে গেছে।

কাজলের হাতটা ধরে ও বলল, কে···

থর থর করে শরীর কেঁপে উঠল কাজলের। মরমে মরে যেতে ইচ্ছে করল।

প্রায় বুজে-আসা গলায় বলল, আমি।

হাত ছেড়ে দিল কাঞ্চন।

—এখনও জেগে রয়েছো?

—আপনার শরীর এখন কেমন আছে দেখতে এসেছিলাম।

—বোধহয় জ্বর ছেড়ে গেছে। খুব ঘাম হচ্ছে। কাজল···

—বলুন?

—আমার অসুখ হওয়ায় খুব ভয় পেয়ে গেছো বোধহয়?

—হ্যাঁ!

সাগ্রহে কাঞ্চন বলল, কিসের ভয় ?

—আপনার নিজের লোক এখানে কেউ নেই। যদি বাড়াবাড়ি হয়, তাই ভয় পেয়ে গেছি।

অনেক আশা নিয়ে প্রশ্ন করেছিল কাঞ্চন, উত্তর শুনে নিরাশায় ভরে গেল মন।

—ও! আমি একলা বেশ থাকতে পারব। তুমি শুতে যাও।

একরকম ছুটে কাজল নিজের ঘরে ফিরে এল। উপুর হয়ে পড়ল বিছানার ওপর। চোখ থেকে অজস্র জল গড়িয়ে পড়ে বিছানা ভিজিয়ে দিল। এ কিসের কান্না ? ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জা—না, নিজের সঙ্কল্প থেকে ক্রমেই চ্যুত হয়ে যাওয়ার গ্লানি ?

কাঞ্চনের নিউমোনিয়া হয় নি। দিন পাঁচের মধ্যেই চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। ডাক্তার কয়েকদিন বিশ্রাম নিতে বলেছেন। ঝোল-ভাত ধবনের হাল্কা পথ্য এখন চলবে। সেই রাত্রের ঘটনার পর কাজল নিজেকে অসম্ভব গুটিয়ে নিয়েছে। প্রয়োজনীয় কাজগুলো করে সাধ্যমত এড়িয়ে চলে কাঞ্চনকে।

মান্নামাসি এলেন।

আপাদমস্তক কাঞ্চকে দেখে নিয়ে বললেন, শুনলাম, তোমাব শরীর খারাপ হয়েছিল ? আমাকে খবব পাঠাও নি কেন ?

—বিশেষ কিছু হয় নি। এখন ভাল আছি। আমার শরীর খারাপ হওয়ার কথা কোথায় শুনলেন ?

—কয়েকদিন আসছ না দেখে তোমার অফিসে ফোন করেছিলাম। তোমাদের অপারেটর তোমার অসুখের সংবাদ দিল।

ঢুনিয়ায় অনেক কিছু দেখেছেন মান্নামাসি। অনেক উত্থান-পতনকে অতিক্রম কবে আসায় অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন প্রচুর। ওই সমস্ত অভিজ্ঞতার জোরেই বুঝতে পেরেছেন, কাজল ও কাঞ্চনের মধ্যেকার সম্পর্ক তেমন সরল নয়। একটা খিচ আছে। আর সেই খিচকে মূলধন করেই দ্বিতীয় কিস্তির পরিকল্পনা নিয়ে আসরে নেমেছেন এবার।

—বৌ খুব সেবা করল তো ?

মুখে হাসি টেনে কাঞ্চন বলল, সেবা করার আর কি আছে বলুন না ?

—আছে বৈকি ! স্বামীর শরীর খারাপ হলে স্ত্রী ভয়ে-ভাবনায় আধখানা হয়ে যায়, তা সত্ত্বেও প্রাণ ঢেলে দেয় সেবায়।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে গলা চেপে বললেন, মেয়েটি তেমন গা লাগায় নি বুঝতে পারছি। তোমার মনের অবস্থা খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। ওকে নিয়ে খুবই অসুবিধেয় পড়েছো বোধহয় ?

— ঠিক অসুবিধে নয়……..

কাজল বই হাতে নিয়ে বসেছিল বসবার ঘরের সোফায়। মান্নামাসি আসতেই সে রান্নাঘরে চলে গেল। মান্নামাসি অবশ্য বসবার ঘরে থামেন নি। চলে গিয়েছিলেন কাঞ্চনের ঘরে।

—আমার কাছে লুকিও না কাঞ্চন। আমি সমস্ত ব্যাপারটাই আঁচ করেছি ! তোমরা দুজনে দুজনকে মানিয়ে নিতে পারছ না, আমি জানি।

কাঞ্চন অসহিষ্ণু গলায় বলল, দেখুন, আমি মানিয়ে নেবার কম চেষ্টা করি নি। তালি তো একহাতে বাজতে পারে না। যাকগে, দুটো বছর তো, দেখতে দেখতেই কেটে যাবে ঠিক।

—কথার মানে বুঝতে পারলাম না।

—এখানে থেকে ও এম.এ পাশ করে গেলেই আমাদের সম্পর্ক শেষ হবে।

মান্নামাসি বিচিত্র কথা শুনলেন। শুনে বরং উৎসাহিত হলেন।

—তোমরা নিজেদের মধ্যে এগ্রিমেণ্ট করেছো নাকি ?

—এগ্রিমেণ্ট ঠিক নয়—

মান্নামাসি গলার পর্দা আরো নামিয়ে বললেন, তুমি ছেলেমানুষ। অনবরত ঠকে চলেছো। অবস্থা বিপাকে তোমাদের বিয়ে হওয়ার পরও কাজল যদি তোমার সঙ্গে মানিয়ে নিত, বলার কিছু ছিল না। তা যখন হয় নি, তখন তোমারও আর চুপ করে বসে থাকা চলে না।

—আপনি কি বলতে চাইছেন ?

মান্নামাসি গলায় অন্তরঙ্গতার সুর টেনে বললেন, এ ব্যাপারে আমার মাথা গলাবার কি দরকার, বল? শুধু তোমাকে স্নেহ করি—তোমার ভাল চাই বলেই আজ আর কিছু না বলে থাকতে পারছি না। ওই বেহারী মেয়েটি তোমার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছে না, তবু কেন এখনও তোমার কাছে রয়েছে, বলতে পার? স্বার্থের জন্যে। তোমার পয়সায় এম.এ. পাশ করাই তার স্বার্থ।

—দেখুন, জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না।

—যায়। আমি যা বলছি তাই হল আদত কথা। আমার মতে ওকে মুঙ্গেরে পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল।

—মুঙ্গেরে পাঠিয়ে দেব!

—ক্ষতি কি?

কাঞ্চন নিজের হারিয়ে যাওয়া ভাবকে ক্রমে ধাতস্ত করে এনেছে।

সমস্ত কিছুকে ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে বলল, এখন থাক ও-কথা। আপনাদের আবার গ্যাদারিং কবে?

—সামনের থার্টি ফার্স্ট।

মান্নামাসি আর ও-প্রসঙ্গ তুললেন না। একদিনে বেশি চাপ দিয়ে লাভ নেই। যা বলেছেন তাই যথেষ্ট। হাল্কা আলোচনায় কিছু সময় আরো কাটিয়ে তিনি উঠলেন। যাবার আগে অবশ্য কাঞ্চন যাতে নিজের শরীরের ওপর নজর রাখে সে বিষয়ে বারংবার সতর্ক করে গেলেন।

মান্নামাসি চলে যাবার পর কাঞ্চন ভাবনায় পড়ে গেল। সত্যিই কি সম্পূর্ণ স্বার্থের তাগিদে ওর কাছে আছে কাজল? বলেছিল, কলকাতায় গিয়ে এম এ. পাশ করতে চাই। এই অনুহগ্রটুকু আপনার কাছ থেকে আমার না নিয়ে উপায় নেই।

এতদিন একসঙ্গে থেকে ওর মনের কি বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নি? হয়েছে—হয়তো হয় নি। মনের আসল খবর কি কে জানে?

—দুধটা খেয়ে নিন।

চমকে মুখ ফেরাল সে।

কাজল এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে দুধের গেলাস।

—দুধ! আমি—আমি তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব? তুমি কি এম.এ. পাশ করবার পর সত্যি আমার কাছ থেকে চলে যাবে?

কাঞ্চনের মুখে ফুটে উঠল ব্যগ্র জিজ্ঞাসা।

কাজল এখন এই প্রশ্ন আশা করে নি।

তার কথার উত্তর না দিয়ে বলল, দুধ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

—আমার কথার উত্তর দাও!

—আমি পড়ব না।

—পড়বে না! সেকি—

—আমায় একটা চাকরি জোগাড় করে দিন।

কাজলের কথায় কাঞ্চনের হতবাক্ না হয়ে উপায় কি!

—চাকরী করবে! আমাদের বাড়ির বৌরা কখনও চাকরি করে নি। এরকম ব্যতিক্রম কখনও হয় নি।

কাজল বলল, আমি তো সাক্ষাত ব্যতিক্রম। আজ পর্যন্ত আপনাদের বাড়িতে কোন অবাঙালী মেয়ে বৌ হয়ে এসেছে কি?

—তা অবশ্য আসে নি। কিন্তু তুমি পড়বে না কেন? সঙ্গত কারণ আছে নিশ্চয়ই! আমি তো আপত্তি করি নি।

কাজল কিছু বলতে গিয়েও বলল না।

—বল! চুপ করে থেকো না।

—আগে বুঝতে পারি নি। এখন মনে হচ্ছে, আপনাকে এত বিরক্ত করা আমার উচিত হয় নি। চাকরি পেলে স্বাবলম্বী হয়ে যাব। আপনিও শান্তি পাবেন।

—আমি ওরকম শান্তি চাই না। তোমার চাকরী করা হবে না।

কাজলের মনের মধ্যেটা বিদ্রোহ হয়ে উঠল। মনে হল কাঞ্চনের গলার আওয়াজে স্বামী সুলভ কর্তৃত্বের আভাস রয়েছে।

—যে সামাজিক বন্ধনকে আমরা মানছি না, তার জের টেনে আমার ওপর জোর খাটান আপনার উচিত নয়।

অধৈর্য গলায় কাঞ্চন বলল, কেন মানছি না? তোমার মত মেয়ের কি উচিত তুচ্ছ প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া?

—আপনি ও-সমস্ত কথা বলবেন না। প্রাদেশিকতা ভাল কি খারাপ, আমি জানি না। তবে আমার মনকে বিষিয়ে দেওয়ার জন্তে দায়ী আপনারা। আপনি বাঙালী আর আমি বেহারী, এছাড়া আমাদের আর কোন পরিচয় নেই।

—আছে। ছুটো পরিচয় আরো আছে। আমরা ভারতীয়, আমরা স্বামী-স্ত্রী।

কাজল আর দাঁড়াল না। ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। গেলাসের ছুধ চলকে চলকে পড়ল এখানে-ওখানে।

ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে দিনকয়েক বিশ্রাম নেবার পর কাঞ্চন অফিসে যোগ দিল। অফিসে গিয়ে কাজে তেমন উৎসাহ পেল না। মনের মধ্যে নানা চিন্তা জট পাকাচ্ছে। সমস্ত ছুপুর এইভাবে কাটল।

অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ও রাস্তায় নেমে এল। ফুটপাথ ধরে জন-স্রোত চলেছে। ট্রামে-বাসে বাছুড়ের মত ঝুলে রয়েছে মানুষ। যে কোন মুহূর্তে হাত ফস্‌কে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সে সম্ভাবনার ঝুঁকি নিয়েও তারা চলেছে। চলেছে সারা দিনের পরিশ্রমের পর নিজেদের প্রিয়জনের সঙ্গে মিলতে।

সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। এই সমস্ত হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে তার পার্থক্য কত প্রকট। ওর প্রিয়জন আছে, ও তার কাছে যাবার জন্তে ব্যস্ত নয়। প্রিয়জনও আকুল আগ্রহ নিয়ে বসে নেই। তবু ওকে বাসায় ফিরতে হবে। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে হবে।

এই ভীড়ে ট্রামে-বাসে ওঠা অসম্ভব। ট্যাক্সি যে পাওয়া যাবে, তাও নয়। এখন ভগবানকে পাওয়া বোধহয় সহজ, ট্যাক্সিকে নয়। তবু ট্যাক্সির সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

হঠাৎ ওর দৃষ্টি পড়ল ফুটপাথের ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়ির ওপর।

গাড়িতে বসে আছে সুতপা।

সে এগিয়ে গিয়ে বলল, আপনি এখানে!

ওর দিকে তাকিয়ে সুতপা সাগ্রহে বলল, আপনার জন্মে অপেক্ষা করছিলাম।

—আমার জন্মে!

—কথা না বাড়িয়ে গাড়ির মধ্যে আসুন।

ভেতরে বসতেই সুতপা গাড়িতে ষ্টার্ট দিল। ডালহাউসির জনসমুদ্রকে পেছনে ফেলে, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটের মধ্যে দিয়ে, গভর্ণর হাউসকে পাশ কাটিয়ে ইডেন গার্ডেনকে পেরিয়ে, গঙ্গার ধারে এসে সুতপা বলল, কি বলছিলেন?

—আমাদের অফিসের সামনে আপনাকে গাড়ি নিয়ে উপস্থিত থাকতে দেখব, আশা করি নি।

—এদিকে এসেছিলাম। ভাবলাম আপনাকে লিফ্‌ট দিই।

—ট্যাক্সি পাচ্ছিলাম না। ভালই হল আপনি এসে পড়লেন। এদিকে এলাম কেন? আমি তো নর্থে থাকি।

—আসুন, গঙ্গার ধারে একটু বসি। মন ফ্রেস করবার এরচেয়ে ভাল জায়গা আব বোধহয় নেই। আপনি কি বলেন?

—গঙ্গা আছে বলেই পরিশ্রান্ত মানুষদের এখনও কলকাতাকে ভাল লাগে।

গাড়ি থেকে নেমে ওরা পোর্ট কমিশনার্সের লাইন পেরিয়ে পাড়ে পড়ে থাকা অসংখ্য গাছের গুঁড়ির একটার ওপর বসল। কাঞ্চন অনিচ্ছার সঙ্গেই ভদ্রতা বজায় রাখল।

সুতপা বলল, আগে ব্যাফে ছিল। আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মারতাম। জমজমাট আড্ডা হত আমাদের। ব্যাফে উঠে গিয়ে বেশ অসুবিধে হয় আজকাল।

—আমি কখনও ব্যাফেতে আসি নি। শুনতাম, ওখানে প্রগতিশীল সমাজের মেয়ে-পুরুষেরা আসা-যাওয়া করেন। কেন উঠে গেল কে জানে।

হাল্কা প্রসঙ্গ নিয়ে গল্প চলতে লাগল।

আধ ঘণ্টাটাক পরে কাঞ্চন বলল, এবার আমি উঠব।

—উঠবেন। মহা আশ্চর্য হয়ে সুতপা বলল, এখুনি উঠবেন কি? বসুন। আরো কিছুক্ষণ গল্প করি।

—কাজল বাসায় একলা আছে। আমাকে সময়মত ফিরতে না দেখলে ব্যস্ত হবে।

—ব্যস্ত হবে?

খিলখিলিয়ে হেসে উঠল সুতপা।

—ব্যস্ত হবে না ছাই। আমি সব জানি। মা-র মুখ থেকে সব কিছু শুনে নিয়েছি।

—আপনি যা শুনেছেন মিথ্যে নয়। কিন্তু ব্যস্ত সে হবেই। এই বিরাট শহরে আমি ছাড়া তার আর কোন অবলম্বন নেই।

ফিরতে দেরি হলে কাজল ব্যস্ত হবে কিনা সে জানে না। উপস্থিত সুতপার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে এই পথ অবলম্বন করা ছাড়া উপায় কি?

—শুনলাম এম.এ পাশ করার পরই নাকি পাখি উড়ে যাবে! আপনি কেন যে ওকে টলারেট করে যাচ্ছেন, ভেবে আশ্চর্য হই।

কাঞ্চন হাসবার চেষ্টা করল।

—দশজনের সামনে আগুন সাক্ষী করে তাকে বিয়ে করেছি। তার সমস্ত দায়িত্ব আমার। টলারেট না করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

—ওয়ান সাইডেড্ কোন কিছুই বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। এই নিয়ে কত হাসাহাসি হচ্ছে সোসাইটিতে, সে খোঁজ রাখেন?

—হাসাহাসি! আপনার কথা শুনে আমি অবাক হচ্ছি। আপনাদের সোসাইটির সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠ নই। আপনার মা বারকতক আপনাদের ক্লাবে আমায় নিয়ে গেছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁদের কাউকে চিনি না পর্যন্ত। সুতরাং আমার বিবাহিত-জীবন নিয়ে তাঁদের হাসি-ঠাট্টা করবার কিছুই নেই।

—আপনি মিথ্যে উত্তেজিত হচ্ছেন। সুতপা বিচিত্র সুরে বলল, আপনি আমাদের সমাজের কেউ নন সত্যি, তবে সকলেই আপনাকে চেনে। আপনাকে একজন অবাঙালী মেয়ে দিনের পর দিন লেজে খেলিয়ে চলেছে,

হাসি-ঠাট্টা লোকে করবে বৈকি !

কাঞ্চন শান্তগলায় বলল, লেজে খেলাচ্ছে বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন, আমি জানি না। ও প্রসঙ্গ নিয়ে সব সময় আলোচনা করতে আমার ভাল লাগে না। আর বসব না, উঠি এবার !

পরের দিনও ঠিক ওই একই ব্যাপার ঘটল।

সুতপা ছুটির পর কাঞ্চনের অফিসের সামনে এসে উপস্থিত গাড়ি নিয়ে। অনিচ্ছার সঙ্গে তাকে গাড়িতে উঠে বসতে হল। একজন মহিলার মুখের ওপর সরাসরি না বলাটা শালীনতার পরিচায়ক নয় বলেই বোধহয়।

এরপর প্রতিদিনই চলতে লাগল এই একই ব্যাপার। অফিস থেকে বেরিয়ে যন্ত্রচালিতের মত গাড়িতে গিয়ে ওঠে সে। ঘণ্টাকয়েক ঘুরে-ফিরে অবিনাশ ম্যানসনের সামনে ওকে নামিয়ে দেয় সুতপা।

কাজলের কিন্তু ব্যাপারটা অজানা নেই। নিজের ঘরের জানলা থেকে একদিন একই গাড়িতে সুতপা ও কাঞ্চনকে আসতে দেখল। তারপর প্রতি-দিন দেখছে।

অবিনাশবাবুও জেনে ফেলেছেন। তিনি টুকলেন একদিন।

কাঞ্চন সুতপার গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ির কাছাকাছি এসেছে, অবিনাশ-বাবু নিজের ঘরের দরজার কাছ থেকে হাঁক ছাড়লেন, ভায়া যে—

—এই অফিস থেকে ফিরছি !

টাকে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি এগিয়ে এলেন।

—এই বাসায় ফিরছো বল ! ঘণ্টা দুয়েকের আগে কি আর অফিস থেকে না বেরিয়েছো ?

—একথা বলছেন কেন ?

ফিসফিস করে অবিনাশবাবু বললেন, বলি, মেয়েটি কে ?

সে সসঙ্কোচে বলল, ওই মেয়েটি মানে····

—যার সঙ্গে মোটরে ফিরছো প্রত্যহ ! বুড়ো হলেও চোখ-কান খুব সজাগ আমার। কাজটা কি খুব ভাল হচ্ছে ভায়া ? ঘরে বৌ রয়েছে,

পরের মেয়েকে নিয়ে টানাটানি করাটা কি ভাল ?

—গুরুত্ব দেবার মত এখনও কিছু ঘটে নি। আপনাকে সমস্ত কথা খুলে বলব পরে।

এগারো

আজ সকাল থেকেই কেন কে জানে, কাঞ্চনের মন ভাল ছিল না। অফিসে এসেও এক অস্বোয়াস্তির মধ্যে সময় কাটাচ্ছে। এদিকে সময় কারুর জন্যে বসে নেই, ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে সাড়ে চারটের ঘরে গিয়ে আটকাল। ঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়তেই তার মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল।

আর কিছুক্ষণ পরেই সুতপা গাড়ি নিয়ে আসবে। তারপর ঘণ্টা দুয়েক বিরক্তিকরভাবে আগলে রাখবে। নিজের গুণগানে পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে। ওকে নিজের দিকে আকর্ষণ করবার নানা ছলাকলার আশ্রয় নেবে। বলতে চায় না এমনিভাবে কাজলের বিরুদ্ধে বিষ উগরে দেবে।

কাঞ্চন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

সুশোভন ঘরে এল।

কাঞ্চনের কলিগ সুশোভন পালিত। একই সঙ্গে দুজনে কাজে ঢুকেছে এই অফিসে। দুজনের মধ্যে আছে গভীর হৃদ্যতা। পাশাপাশি দুটো ঘরে ওরা বসে।

সুশোভন একটা চেয়ারে বসল, ঘন ঘন কয়েকবার সিগারেটে টান দিয়ে কাঞ্চনের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার আজ যেন কেমন মিঁইয়ে পড়া ভাব দেখছি, কি হয়েছে ?

—তেমন কিছু নয়। সে মুখে হাসি টেনে বলল, একটা স্ট্যাণ্ডিং হেডেক থেকে কিভাবে রেহাই পাওয়া যায় তাই ভাবছি।

—হেডেক !

—জানলা দিয়ে ঝুঁকে দেখ তো, অফিস বিল্ডিংয়ের সামনে ব্রাউন কালারের কোন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কি না!

সুশোভন জানলার কাছে গিয়ে ঝুঁকে নিচের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, রয়েছে।

—গাড়ি ড্রাইভ করে নিয়ে এসেছে একটি মেয়ে। আমার হেডেক। প্রত্যহ এই সময় আমার ওপর চড়াও হচ্ছে।

—খুবই মিষ্টি হেডেক!

—মিষ্টি হোক বা টক, তাতে কি আসে যায়! হেডেক হেডেকেই। ওর কাছ থেকে কিভাবে রেহাই পাওয়া যায় বলতে পার?

—পারি বৈকি! দু-চার দিন এড়িয়ে যাও, সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে। এখন এক কাজ করতে পার। বেয়ারাকে দিয়ে স্লিপ পাঠিয়ে দাও। স্লিপে লিখে দেবে, তুমি অফিসে নেই। তিনটের সময় বিশেষ কাজে বরানগর চলে গিয়েছো। ব্যস, গাড়ি নিয়ে গাড়িওয়ালী হাওয়া হয়ে যাবে।

—মন্দ যুক্তি নয়!

সে বিশেষ কাজে লাঞ্চের পরই বরানগরে যাচ্ছে। আজ সুতপার সঙ্গে দেখা করতে না পারায় দুঃখিত ইত্যাদি, এই ধরনের একটা চিঠি লিখে বেয়ারার হাতে দিয়ে সুতপার কাছে পাঠিয়ে দিল।

বেয়ারা চলে গেলে সুশোভন বলল, ব্যাপারটা কি?

—তোমাকে মায়ামাসির কথা বলেছিলাম না—সেই যে সোসাইটি লেডি, আমাকে তিনি শাঁসাল মক্কেল মনে করে আমার পেছনে নিজের কন্যাটিকে লেলিয়ে দিয়েছেন। আমার ড্র-ব্যাক তো তোমার জানা আছে, মুখের ওপর সহজে কাউকে কিছু বলতে পারি না।

—দেখতে কেমন?

—চলনসই। বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করছে না। এখন কি করা যায় বল তো?

—চল, আমার সঙ্গে এক জায়গা থেকে ঘুরে আসবে।

কাঞ্চন চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল, তোমার এক জায়গা মানে, কোন বার নিশ্চয়ই?

—বলা বাহুল্য। প্রত্যহ পেটে রামৃয়ের ছিটে-ফোঁটা না পড়লে মোটেই এনার্জি পাই না। আর এনার্জি না নিয়ে বাড়ি ঢুকলে বৌয়ের সমস্ত ঝড়-ঝাপ্‌টা সহ্য করতে পারব কেন ভাই?

—ঝড়-ঝাপ্‌টা খুব চলেছে বুঝি?

—আর বল কেন— দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে সুশোভন বলল, শালা শ্বশুরকে হাতের কাছে যদি পেতাম! মরে ফাঁকি দিয়েছে। কেমন হাসি হাসি মুখে নিজের মেয়েটিকে চাপিয়েছিল আমার ঘাড়ে। এখন হাড়ে হাড়ে ঠেলাটা বুঝছি।

কাঞ্চন র‍্যাকের কাছে এগিয়ে গেল। র‍্যাক থেকে কোট নামিয়ে পরে নিয়ে বলল, চল, আজ তোমাকেই সঙ্গ দেওয়া যাক। কিন্তু তার আগে দেখে নাও জানলা দিয়ে, ব্রাউন গাড়িটা গেছে কিনা।

সুতপার গাড়ির চিহ্নমাত্র ছিল না তখন।

ওরা দুজন অফিস থেকে বেরুল। পায়ে হেঁটে গল্প করতে করতে চৌরঙ্গীতে এল দুজনে। ওই এলাকার একটা বারে গিয়ে ঢুকল। এই বারটি খুব পছন্দ করে সুশোভন। ড্রিঙ্ক যে কাঞ্চন কখনও করে নি তা নয়, কালে-ভদ্রে কারুর পাল্লায় পড়ে মাত্রা বজায় রেখে ড্রিঙ্ক করেছে।

কোণের দিকের একটা টেবিলে সামনা-সামনি গিয়ে দুজনে বসল।

—তোমার জন্যে কি অর্ডার দেব? সুশোভন প্রশ্ন করল।

—জিঞ্জার।

—ভুলেই গিয়েছিলাম তুমি ভালছেলের দলে। তুমি জিঞ্জারই খাও বাপু! ওই পানসে জলে আমার পোষাবে না।

আটটা নাগাত বৌবাজারের মোড়ে সুশোভনকে নামিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি করে সোজা টার্নার রোডে চলে এল কাঞ্চন। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে রাস্তা পার হয়ে অবিনাশ ম্যানসনে ঢুকতে যাবে, দেখল, ব্রাউন রঙয়ের ফিফ্‌টি ওয়ান মডেল দাঁড়িয়ে আছে। ষ্টিয়ারিং-এ হাত রেখে বসে আছে সুতপা।

সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করে উঠল কাঞ্চনের। এখানে এসে উপস্থিত

হয়েছে! এই রাত্রে ওকে নিয়ে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে আছে নাকি? সুতপার দিকে তাকাল ও। তার মুখে গাম্ভীর্যের ঢল নেমেছে।

—তুমি? কাঞ্চন প্রশ্ন করল।

—বেশ কিছুক্ষণ ধরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে দুজনে কয়েকদিন আগেই।

—এখানে কেন? আমার ফ্ল্যাটে গিয়ে বসলেই তো পারতে।

—ওই আন্‌কাল্‌চার্ড দেহাতি মেয়েটা যেখানে আছে?

—আন্‌কাল্‌চার্ডের পরিভাষাটা আমার জানা নেই। তবে কাজলকে দেহাতি বললে আমাকেও দেহাতি বলতে হয়। আমাদের জন্মস্থান একই জায়গায়।

ও-কথায় কান না দিয়ে সতেজ গলায় সুতপা বলল, তুমি অফিসে ছিলে, অথচ আমাকে লিখে পাঠালে অনেক আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে গেছো! এর অর্থ কি?

—আমি—

—অস্বীকার করো না। তুমি যে স্লিপ আমাকে পাঠিয়েছিলে, তার অক্ষরগুলোর কালি তখনও সব শুকিয়ে যায় নি। এরপরও বলতে চাও, তুমি দুপুরে অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলে?

সুতপার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে প্রশংসা না করে পারে না কাঞ্চন।

বলল, আসল কথা হল, আমাদের কন্‌ফারেন্স ছিল।

—সত্যি কথাটা আমায় নিচে এসে বলে গেলেই পারতে। কাল ঠিক পাঁচটার সময় আসছি। কাল নিশ্চয়ই কোন কন্‌ফারেন্স নেই।

কাঞ্চনের উত্তরের অপেক্ষা না করেই গাড়িতে ষ্টার্ট দিল সুতপা।

উত্যক্ত মনের অবস্থা নিয়ে কাঞ্চন ওপরে উঠে চলল। নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিল না। কেন সুতপার মুখের ওপর পরিষ্কারভাবে বলে দিল না প্রকৃত কথাটা? কেন এইভাবে মিথ্যার জাল বুনে চলেছে?

এরপর দিন তিনেক কাঞ্চন দেখা করল না সুতপার সঙ্গে। সুতপা বেয়ারার মুখে জানতে পারল, ব্যানার্জী সাব অফিসে নেই। কোথাও-না-কোথাও গিয়ে সময় কাটিয়েছে কাঞ্চন, ফ্ল্যাটে ফিরেছে রাত ন-টার পর।

পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধাবন করে চতুর্থ দিন যুদ্ধক্ষেত্রে মান্নামাসি স্বয়ং অবতীর্ণা হলেন। কাঞ্চনের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর ওর সম্বন্ধে আর কোন আগ্রহ তাঁর থাকা উচিত ছিল না। তবু তার পেছনে ফেউয়ের মত লেগে থাকার উদ্দেশ্য হল, নিজের সম্মানকে যে-কোন উপায়ে এখন রক্ষা করে যাওয়া।

কাঞ্চন তাঁর ভাবী-জামাতা একথা সকলেই জানত! অথচ সেই কাঞ্চন আচমকা বিয়ে করে বসল! সোসাইটিতে মাথা কাটা গেছে মান্নামাসির। কাজলকে কোন উপায়ে এখন সরিয়ে দিতে পারলেই সমস্ত দিক রক্ষা পায়। তিনি তখন সহজেই প্রচার করতে পারবেন, বাধ্য হয়ে বিয়ে করা অবাঙালী মেয়েটার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। রেহাই পেয়ে বেঁচেছে। এখন সুতপাকে বিয়ে করতে আর কোন অসুবিধে রইল না।

অনেক তালিম দিয়ে মান্নামাসি সুতপাকে কাঞ্চনের পেছনে লাগিয়ে দিলেন। চেষ্টার ত্রুটি করে নি সুতপা, কিন্তু কাঞ্চনের মনে রঙ ধরান গেল না। মান্নামাসি হিসেব করে দেখলেন, লাভের মধ্যে বেশ কিছু টাকার পেট্রোল পুড়ে গেছে এ ক-দিনে। অগত্যা বিশেষ এক পরিকল্পনা খাড়া করে তিনি কাঞ্চনের ফ্ল্যাটে এলেন দুপুরে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে কাজল জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিল অন্যমনস্কভাবে। দরজায় করাঘাত হতে অবাক হল। দুপুরে কে এল আবার! কোন বিশেষ প্রয়োজনে কাঞ্চন কি ফিরে এসেছে অফিস থেকে?

দরজা খুলল। চৌকাঠের ওপারে হাসি হাসি মুখে মান্নামাসি দাঁড়িয়ে। কাজল হতবাক্। এই মহিলাটি এ সময় এখানে!

মান্নামাসি হিন্দী জানেন না। কাজল যে বাংলা কথা বলতে পারে না, তাও তিনি জানেন। কাজেই ইংরাজীর আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

—আমি ভেতরে আসতে পারি?

—আসুন!

ঘরে প্রবেশ করে তিনি সোফায় বসলেন।

—উনি তো নেই। অফিস গেছেন।

—জানি। আমি তোমার কাছেই এসেছি। তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটি কথা আছে।

—আমার সঙ্গে!

মাস্নামাসি মিষ্টি করে হাসলেন।

—অবাক হচ্ছো? আমিও অবশ্য তোমার জায়গায় থাকলে তোমারই মত অবাক হতাম। আমি এখন এসেছি তোমার ভালোর জন্মেই।

কাজল মনের উত্তেজনা দমন করে বলল, বলুন?

—কথাটা কাঞ্চনকে নিয়েই। কথাটা বলতে আমার খুবই সঙ্কোচ হচ্ছে। না বলতে পারলেই আমি খুশি হতাম। কিন্তু কোন উপায় নেই। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি।

কাজল বসে নি। অন্যদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—তোমাদের দুজনের সব কথাই আমি জানি। কাঞ্চন নিজের মাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। সে তাঁর অনুরোধ এড়াত না পেরে তোমাকে বিয়ে করেছে। মনে মনে কত অসুখী সে, তার সংবাদ তুমি রাখ না। অন্যের বেলায় অসুখী হওয়ার প্রশ্ন অবশ্য উঠত না। কিন্তু তুমি সুশ্রী, তুমি শিক্ষিতা, তোমার মত স্ত্রী পাওয়া ভাগ্যের কথা—তোমার জেদকে সহজ করে তোলা কাঞ্চনের পক্ষে মোটেই কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু সে তা পারে নি। কারণ, সুতপাকে····

কথাটা শেষ না করেই মাস্নামাসি থামলেন।

—সুতপা আমার মেয়ে— তিনি আবার আরম্ভ করলেন, মেয়ের হয়ে ওকালতি করতে এসেছি, একথা ভাবলে আমার ওপর তুমি অবিচার করবে।

ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তির শেষ ধাপে পেঁীছে কাজল বলল, এ সমস্ত কথা আমায় বলছেন কেন?

—তোমার বুদ্ধি আছে। তুমি বুঝতেই পারছো জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে

কার জন্যে। কাঞ্চন ও সুতপার মধ্যেকার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আঁচ করে নেওয়া বোধহয় তোমার পক্ষে কষ্টকর হয় নি। তুমি মাঝপথে এসে না পড়লে ওদের দুজনের বিয়ে হত।

—আপনি যখন সবই জানেন তখন আমাকে এত কথা বলছেন কেন? আমি তো কারুর প্রতিবন্ধক নই।

মান্নামাসি বেশ স্বাভাবিকভাবে বললেন, প্রতিবন্ধক নও এ-কথা বলছো কিভাবে? এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে এখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করা আইনের চোখে দণ্ডণীয় অপরাধ।

কথাটা বলেই তিনি কাজলের দিকে তাকালেন, তার চোখ লাল হয়ে উঠেছে। দাঁত দিয়ে নির্মমভাবে চেপে ধরেছে নিজের ঠোঁট। এই বুঝি কেটে গিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে।

তিনি আবার বললেন, আমি আসতাম না। কিন্তু কি করব, কাঞ্চনের বারংবার অনুরোধকে এড়িয়ে যেতে পারলাম না। সঙ্কোচের দরুন সে তোমায় কিছু বলতে পারছে না।

—আপনার বক্তব্য বোধহয় শেষ হয়েছে?

মান্নামাসি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর অভিজ্ঞ মন সহজেই অনুমান করে নিল, কিছু কাজ হয়েছে। একদিনে খুব বেশি চাপ না দেওয়াই ভাল।

—তোমার অসুবিধে ঘটালাম বলে দুঃখিত।

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কাজল দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে সোফায় বসল। মনের মধ্যেকার সমস্ত দ্বন্দ্বকে ছাপিয়ে একটা অব্যক্ত কান্না যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। কাঞ্চন সুতপাকে বিয়ে করতে চায়, এই ভাবাবেগ সেজন্যে নয়। সে যাকে ইচ্ছে বিয়ে করুক। কেনই বা করবে না? কাজল বিবাহিতা স্ত্রী হয়েও ওর স্বামীত্বের অধিকার মানে নি। পদে পদে অনেক অসুবিধের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে ওকে। কাঞ্চনকে এ বিষয়ে খুব বেশি দোষী করা চলে না। কাজলের মনকে এখন ঘা দিচ্ছে একটি মাত্র কথা—সমস্ত কথা সে পরিষ্কার-ভাবে তাকে বলে, অথচ এই বিশেষ কথাটা বলতে পাঠিয়েছে মান্নামাসিকে!

পুরুষালী চেহারার ওই মহিলাটিকে অত্যন্ত অপছন্দ করে সে, তা কি কাঞ্চন জানে না?

কাজলের দুচোখ জলে ভরে উঠল।

কেন? অভিমানে কি?

প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় কাঞ্চন অফিস থেকে ফিরল।

ঘরে ঢুকেই কাজলকে থমথমে মুখে বসে থাকতে দেখে একটু আশ্চর্য হল। দরজাটাই বা খোলা কেন? কেউ কি এসে চলে গেছে, কাজল আর দরজা বন্ধ করে নি তারপর! তাকে দেখে কাজল সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সে মনস্থির করে ফেলেছে। ও তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ভালই হল। কিন্তু কিছু আর বলা হল না। দরজায় করাঘাত পড়ল। কাঞ্চন দরজা খুলে দিতেই ঘরে প্রবেশ করল জয়ন্ত।

কাজল পাশের ঘরে চলে গেল।

মহা আশ্চর্য হয়ে কাঞ্চন বলল, কিহে—তুমি! পথ ভুলে নাকি?

—বিশেষ প্রয়োজনে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম, দাদা।

—তাই বল! পিছু টান একটা নিয়েই এসেছো! বস—বস।

জয়ন্ত বসল।

মুখে হাসি টেনে কাঞ্চন বলল, কহ ভগ্নদূত, কি তব বারতা?

এধার-ওধার তাকিয়ে নিয়ে জয়ন্ত বলল, আমি আজই মুঙ্গের থেকে ফিরেছি। কৃষ্ণার চিঠি পেয়ে দিন চারেক আগে গিয়েছিলাম। ফ্ল্যাট বদলেছেন দেখছি! দোতলার এক ভদ্রলোকের কাছে জিজ্ঞেস করে আপনার নতুন ঠিকানা পেলাম।

—হপ্তাদেড়েক হল নতুন ফ্ল্যাটে এসেছি। খবর সব ভাল ওখানকার? পৌঁছান সংবাদ দেবার পর আমি আর চিঠি দিতে পারি নি। মা কিছু বলছিলেন নাকি?

—আমায় কিছু বলেন নি। শারীরিক সুস্থই আছেন সকলে। তবে…

—তবে কি?

—বাড়িতে খুব গোলমাল চলছে। মানে···বিয়ের ব্যাপারটা নিয়েই আর কি।

—গোলমাল! সবিস্ময়ে কাঞ্চন বলল, আমি কাজলকে এখানে নিয়ে এসেছি. এরপর আবার গোলমাল কিসের?

ইতস্তত করে জয়ন্ত বলল, মানে···আমার বলা বোধহয়···

—তোমাকে ইতস্তত করতে হবে না, কি হয়েছে পরিষ্কার করে আমাকে খুলে বল।

—সকলের ধারণা, ওঁকে নিয়ে কলকাতা চলে আসবার পর আপনি অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। বাড়ীর সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখতে চান না।

—কি আশ্চর্য—কে বললে এ সমস্ত কথা?

—কেউ বলে নি, বললাম না, সকলের ধারণা। তারপর আরেকটা বিষয় নিয়ে কিছু গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে।

—দেখ জয়ন্ত, ভনিতা আমার ভাল লাগছে না। যদি সত্যি তোমার কিছু বলবার থাকে, সোজাসুজি বল।

জয়ন্ত গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল, মুঙ্গেরের বাড়ির সকলে জানতে পেরেছেন, নতুন বৌদি ফুলশয্যার পরদিন বাপেরবাড়ি চলে গিয়েছিলেন আর না ফিরে আসবার জন্যে। ওখানে থাকার জায়গা না পেয়ে তিনি বাধ্য হয়ে কলকাতায় এসেছেন আপনার সঙ্গে। এরকম যাঁর মনোভাব, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা বোধহয় ঠিক নয়। দেখুন, আমাকে দোষী করবেন না, যা শুনেছি তাই বলে যাচ্ছি। অনেক আলোচনা, অনেক অশান্তি হয়েছে বাড়িতে। শেষে স্থির হয়েছে, আপনি যদি ওঁর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ না করেন, তাহলে বাবা হয়তো আপনাকে····

জয়ন্ত অর্ধপথেই থেমে গেল।

গরম রক্তের স্রোত কাঞ্চনের মাথায় উঠে এল। কৃষ্ণা ও পিসিমা গুরুতর গোলমাল বাধিয়েছেন, ওর দৃঢ় ধারণা হল।

—কাজলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকলে বাবা আমাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন, তুমি এই কথাই বলতে চাইছো কি?

—সকলে বলছে তাই।

—মা—মা-ও কি বলছেন ওই কথা ?

—তাঁর মনোভাব আমি জানি না।

—ঘটনাটা কিভাবে গড়িয়েছে বুঝতে পেরেছি জয়ন্ত। পিসিমা ও কৃষ্ণা বাড়ির শান্ত পরিবেশ বিষাক্ত করে তুলেছে। তুমি মুঙ্গেরে খবর পাঠিয়ে দিতে পার - যদিও আমি ভাবতে পারছি না বাবার মত নির্বিরোধ লোক এই চক্রান্তের মধ্যে জড়িয়ে আছেন, তবু তিনি যদি সত্যিই শুধু এই কারণেই আমাকে তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চান, করুন। আমি আমার স্ত্রীকে কোন মূল্যেই ত্যাগ করতে পারব না।

জয়ন্ত যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

—উঠলে তুমি ?

—হ্যাঁ, আজ আসি।

—খবরটা আমায় দিয়ে ভালই করেছো। তোমার তো খুশি হবার কথা হে! এখন কুণাল ছাড়া আর কোন অংশীদার রইল না কৃষ্ণার।

জয়ন্ত দ্রুত ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

নিজের মনেই হেসে উঠল কাঞ্চন। বিষাদের হাসি। কতরকম মানুষ আছে পৃথিবীতে! কিন্তু বাবা—না না, ও-কথা আর ভাববে না। নিজের শরীরকে ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

কাজল এল।

যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে কাঞ্চন বলল, অফিস থেকে এত তাড়াতাড়ি কেন ফিরে এলাম বল তো? সেদিন আমাদের বেড়াতে যাওয়া হয় নি, আজ যাব।

কাজল আরো কাছে এগিয়ে এল ওর।

—আপনার অভিনয় নৈপুণ্যের প্রশংসা করতে হয়।

—অভিনয়!

—সমস্তটাই অভিনয়। একধারে অভিনয় করে চলেছেন, অন্যধারে আমাকে অপমান করতেও পশ্চাদ্‌পদ হচ্ছেন না।

কাঞ্চন আকাশ থেকে পড়ল! দ্রুতগলায় বলল, আমি তোমাকে অপমান করছি! সেকি, কি বলছো?

—আমি অস্বীকার করি না, আপনি আমার ওপর অনেক অনুগ্রহ করেছেন। তবে আমি ভাবতে পারি নি এই উদারতার পেছনে কোন উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে।

—উদ্দেশ্য !

—হ্যাঁ, আপনি সুতপাকে পছন্দ করেন, আমি জানি। স্বচ্ছন্দে বলতে পারতেন, তাকে বিয়ে করতে চান। অন্যকে দিয়ে কথাটা বলিয়ে আমাকে অপমান না করালে কি চলছিল না ?

—কি বলছো তুমি ? কে বলেছে তোমায় এ সমস্ত কথা ?

—যাকে আপনি পাঠিয়ে ছিলেন।

—আমি পাঠিয়েছিলাম !

—হ্যাঁ, আপনি পাঠিয়ে ছিলেন। এত কথা আপনি বলছেন, অথচ ওই কথাটা বলবার জন্যে আপনাকে অন্যের সাহায্য নিতে হল ? ছি-ছি, আমার আগেই সরে যাওয়া উচিত ছিল। আমার জন্যে সম্পত্তি থেকেও আপনি বঞ্চিত হতে চলেছেন। কেন-ই বা এত ক্ষতি স্বীকার করবেন ?

—আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব কাজল। চারদিক থেকে সকলে আমাকে পাগল করে ছাড়বে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল কাঞ্চন।

—কেন এত ক্ষতি স্বীঝার করছি আমি, তা যদি বুঝতে পারতে তাহলে কখনই বলতে না, আমি সুতপাকে বিয়ে করতে চাই।

শ্রান্তগলায় কাজল বলল, আমিও আর পারছি না। এইভাবে দিন কাটতে থাকলে আমিও পাগল হয়ে যাব।

একটু থামল কাজল।

—আমি স্থির করে ফেলেছি। মনে হয় আপনিও আমার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করবেন!

—কি তোমার সিদ্ধান্ত ?

—আমি চাই…আমাদের চিরজীবনের মত আইন-সঙ্গতভাবে ছাড়াছাড়ি হোক !

স্তম্ভিত হয়ে গেল কাঞ্চন।

—ডাইভোর্স চাইছো ?

—হ্যাঁ।

—স্বামী-স্ত্রীর এই মিথ্যে পর্দা ঝুলিয়ে রেখে লাভ কি বলছো ! আমার প্রাণভরে হাসতে ইচ্ছে করছে কাজল। আমাদের বাড়ির বৌ ডাইভোর্স চাইছে। আমাদের পরিবারের সম্মানের কথা না হয় নাই চিন্তা করলে ! ঐতিহ্যসম্পন্ন রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে তুমি। তোমার বাবার মত সৎ এবং ধার্মিক মানুষ মুঙ্গের শহরে দুটি নেই—তুমি পারবে তাঁর মনে এইভাবে আঘাত করতে ?

কাজল প্রায় চিৎকার করে উঠল, পারব, পারতেই হবে। দোহাই আপনাব, আপনি আমার অনেক কথা রেখেছেন, এটাও রাখুন। আপনার পরিচয় আমি আর বয়ে বেড়াতে পারছি না।

কাঞ্চন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, ভয় নেই, তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি যাব না। শুধু একটা অনুবোধ আছে, কোর্টে গিয়ে কেলেঙ্কারী বাড়িয়ে লাভ কি ! এমনিতেই তো আমরা দুজনে দুজনের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারি !

—তা হয় না। শুনলাম, আইনে আছে এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে দ্বিতীয় বার বিয়ে করা চলে না।

—তুমি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সমস্ত দোষ আমার ঘাড়েই চাপাবার চেষ্টা করছো। বেশ, মান-মর্যাদা সব যাক, আমি তোমার কথা রাখব। রবারের মত সম্পর্ককে টেনে বাড়িয়ে লাভ কি! আইনসঙ্গতভাবেই সব হবে। আমি কালই উকিলের সঙ্গে কথা বলছি।

কাঞ্চন নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। দরজার সামনাসামনি এসে মুখ না ঘুরিয়েই বলল, যদিও এরপর আর কোন প্রশ্ন আমার করা উচিত নয়, তবু একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, নিজের সম্বন্ধে কি ঠিক করলে ?

—কিছুই ঠিক করি নি, বোধহয় পাটনা যাব। ওখানে গিয়ে পড়তে পারলে চাকরি একটা হবেই।

পরের দিন সাড়ে দশটার সময় কাঞ্চন অফিসে পৌঁছল।

কাল সারারাত ওর ঘুম হয় নি। পায়চারী করে কাটিয়েছে। পাশের ঘর থেকে শব্দ পেয়ে বুঝতে পেরেছে, কাজলের চোখেও ঘুম আসে নি। কেন? তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হচ্ছে, তার তো গভীর ঘুমে অচেতন থাকবার কথা। কাঞ্চন পায়চারী করেছে আর ভেবেছে। ওর আর কাজলের মধ্যে সম্পর্ক যাই হোক না কেন, তবু ডাইভোর্স—? কল্পনার শেষ প্রান্তে পৌঁছেও একথা কাঞ্চনের মনে উদয় হত না।

অফিসে পৌঁছে টেবিলের ওপর থেকে টেলিফোন গাইড তুলে নিল। অল্প খোঁজাখুঁজি করতেই অমিতাভর নম্বর পাওয়া গেল। ওর কলেজের বন্ধু অমিতাভ ঘোষ এখন আলিপুর কোর্টে প্র্যাক্‌টিশ করে। ভাল পসার। বোধহয় এখনও কোর্টে বেরিয়ে যায় নি।

কাঞ্চন রিং করল।

সৌভাগ্যক্রমে অমিতাভ বাড়িতে ছিল। ফোন ধরল এসে। কুশল প্রশ্ন বিনিময়ের পর কাঞ্চন বলল, তুমি আজ ইভনিংয়ে ফ্রি আছো?

—কেন বল তো?

—একজোড়া স্বামী-স্ত্রী ডাইভোর্স করবে। সে সম্পর্কেই কিছু আলোচনা ছিল।

সকৌতুকে অমিতাভ বলল, বল কি! দেখা-সাক্ষাত তো হয় না। এতদিন পরে যদিবা ফোন করলে, তাও এক ডাইভোর্স কেসের পিছুটান রেখে। তারা কারা?

—ধর, আমি আর আমার স্ত্রী।

—ঠাট্টা হচ্ছে!

—না অমিতাভ, ঠাট্টা করি নি। সত্যিই তাই।

—তুমি আবার বিয়ে করলে কবে? আমাদের চোখ বাঁচিয়ে যদিবা করলে, আবার ডাইভোর্সের জন্যে হুড়োহুড়ি কেন?

—সে অনেক কথা ভাই। বলব। আসছো আজ সন্ধ্যায়?

—আজ আসতে পারব না। বিশেষ কাজ আছে। কাল ছুটির দিন, সকালের দিকে আসব।

—বেশ, ওই কথা রইল তাহলে। কাল বেলা ন-টা আন্দাজ আমি তোমায় এক্সপেক্ট করব। এখন ছেড়ে দিচ্ছি।

কাঞ্চন লাইন কেটে দিল।

কাজে মন বসল না। বিক্ষিপ্ত মনে সমস্ত দুপুরটাও রাত্রের মত পায়চারী করে বেড়াল। সিগারেটের টুকরো স্তূপাকার হয়ে উঠল অ্যাসট্রেতে। ওপাশের সাইড টেবিলের ওপর রোজকার মত আজও বেয়ারা ট্রেতে করে চায়ের পেয়ালা, টিকোজি ঢাকা পট ইত্যাদি রেখে গেছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বার তিনেক ঘুরে গেছে সে, সাহেবের খাওয়া হয় নি। ঘরময় চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি।

কাজল কিছু খায় নি গতকাল রাত্রি থেকে। সমস্ত ভাত-তরকারি ঝিকে দিয়ে দিয়েছে। এত বেলা হল এখনও কিছু পেটে পড়ে নি। কয়েকদিন থেকে আগেকার মত কাঞ্চন দুপুরের খাওয়া অফিসে সেরে নিচ্ছে। কাজেই, কোন তাড়া না থাকায় এবেলা আর রাঁধতে ইচ্ছে করল না কাজলের।

রাত্রে সেও ঘুমতে পারে নি। তরল অন্ধকারে ঢাকা বস্তির দিকে তাকিয়ে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছে। মনের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সঙ্গে একটা আক্ষেপ কাজলকে দমিয়ে ফেলেছে। কাল ওই ভাষায় কাঞ্চনকে কথাগুলো না বললেই ভাল হত। একটু মোলায়েম করে বলা চলত। যে মানুষ অনেক দায়িত্বের বোঝা নিয়ে সারাটা দিন কাজ করছে, শ্রান্ত হয়ে ফিরেছে সবে—বিশ্রাম করবার অবকাশ দিয়ে কথাগুলো বললে বোধহয় ভাল হত।

কাজল একে একে কাঞ্চনের সমস্ত ব্যবহার বিচার করে দেখল। ওর ব্যবহারে কোথাও নিষ্ঠার অভাব নেই। সুতপাকে যদি সত্যি বিয়ে করতে চায়, ওকে দোষ দেওয়া যায় না। এর জন্যে সর্বাংশে দায়ী সে নিজে। বিয়ের পর নিজের জেদকে আঁকড়ে থেকে কাঞ্চনের সমস্ত সুখ-শান্তিকে তছনছ করে দেবার জন্যে অন্য কাউকে দায়ী করা চলে না।

কেন বলতে গেল ঝোঁকের মাথায় এত কথা? ওই মাসীমাসি কি চরিত্রের অল্প পরিচয়েই তো কাজল জানতে পেরেছে। তাঁর কথার ওপর নির্ভর করে,

অনুসন্ধান না চালিয়েই কাঞ্চনকে অপমান করা ও নিজের ভবিষ্যতকে সম্পূর্ণ বিপন্ন করে তোলা বিবেচনার কাজ হয় নি। মুখে বলছে বটে পাটনায় যাবে। কিন্তু কাজল ভালভাবেই জানে, পাটনায় চাকরি খুঁজতে যাওয়া আর বুনো হাঁসের পেছনে দৌড়ানর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যৌবনের ভার ও সুশ্রী চেহারা দেখে, সার্টিফিকেট না দেখেই অনেক স্কুলের সেক্রেটারী হয়তো তাকে চাকরী দিতে চাইবেন। কিন্তু তারপর—

নিজের সুস্থ নিষ্কলুষ জীবনকে ওইভাবে ক্লেদাক্ত করে তুলবে কাজল!

আর ভাবতে পারে না। দিনমানেই রাজ্যের অন্ধকার তার চোখের ওপর নেমে আসে। এমন কোন দরজা আজ খোলা নেই, যেখানে গিয়ে সে দুদণ্ড শান্তি পাবে। প্রবল ভয় মনের মধ্যে বাসা বাঁধলেও জেদ এখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তবে কেন কে জানে, ঘুরে-ফিরেই কাজলের চোখের ওপর ভেসে উঠছে সেই একটি দিনের দৃশ্য। খড়কপুরের সেই ডাক-বাংলো। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে। ওঙ্কারের ব্যবহারে বিপর্যস্ত হয়ে সে যখন অসহায় বোধ করছে—তখন কাঞ্চন ভিজতে ভিজতে এল সেখানে। দীর্ঘকায় সুঠামদেহী কাঞ্চন। বিদ্যুতের আলোয় ওকে দেখতে পেয়ে কত সাহস পেয়েছিল, কত নির্ভরতা অনুভব করেছিল কাজল সেদিন। তাছাড়া এখনও কানে বাজছে জয়ন্তকে গতকাল যে কথা বলেছিল কাঞ্চন। পাশের ঘর থেকে পরিষ্কার শুনতে পেয়েছিল সে—আমি আমার স্ত্রীকে কোন মূল্যেই ত্যাগ করতে পারব না।

ঘড়িতে পাঁচটা বাজল। কাঞ্চন র‍্যাক থেকে কোটটা নিয়ে অফিসের বাইরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হল। বেয়ারা স্লিপ নিয়ে এল। কাঞ্চন ভ্রূ কুঁচকে স্লিপটা দেখল। সুতপা অপেক্ষা করছে ওয়েটিং হলে। আজ আর গাড়িতে নয়, অফিসের মধ্যে চলে এসেছে।

বেয়ারার দিকে তাকিয়ে বলল, মেমসাহেবকে গাড়িতে গিয়ে বসতে বল। আমি এখুনি যাচ্ছি।

বেয়ারা চলে যাবার কয়েক মিনিট পরে কাঞ্চন নিচে নেমে এল। সুতপার

পাশে গিয়ে বসল গাড়িতে।

ষ্টার্ট নিয়ে সুতপা বলল, তোমাকে আজ গম্ভীর দেখাচ্ছে?

—তেমন কিছু নয়। কাল দুপুরে তুমি আমার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলে?

—কই, না।

—তোমার মা?

—গিয়েছিলেন বোধহয়।

গাড়ি তখন ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটকে পেছনে ফেলে এস্প্ল্যানেড ঈষ্ট-এ এসে পড়েছে।

—আমরা কোথায় যাচ্ছি বল তো?

—কোথায়?

—সানি পার্কে। ঘরোয়া ফাংশন আছে একটা।

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব।

কাঞ্চন সিগারেট ধরিয়ে বলল, তোমার মা আমাদের ফ্ল্যাটে কেন গিয়েছিলেন?

—আমি জানি না।

—জান ঠিকই, বলতে চাইছো না। আমিই বলছি শোনো—তিনি গিয়েছিলেন কাজলকে এমন কতকগুলো কথা বলতে, যা তিনিই একমাত্র বলতে পারেন।

—অর্থাৎ?

—বিস্তারিতভাবে আমার কিছু জানা নেই। জানবার আগ্রহও প্রকাশ করি নি। তবে তার ফলাফলটা শুনে রাখ। তাতে তোমার ও তোমার মা-র আনন্দিত হবার কথা। কাজলের সঙ্গে আমার ডাইভোর্স হয়ে যাচ্ছে খুব শীঘ্রই।

—সত্যি? সুতপার চোখ দুটো আনন্দে নেচে উঠল।

—উকিলকে খবর দিয়েছি। কাল সকালে আসবে। তখনই সব পাকাকাকি হয়ে যাবে। তবে—

—তবে কি?

—কাজলের সঙ্গে আমার ডাইভোর্স হবে ঠিকই— কাঞ্চন শান্ত গলায়

বলল, তবে তোমার মা যে পরিকল্পনা করেছেন, সেই পরিকল্পনায় আমার সমর্থন নেই।

—তার মানে ?

—সাদা কথায়, কাজলের শূন্যস্থানে তোমাকে বসানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

আরেকটু হলে একটা ইলেক্‌ট্রিক পোষ্টের ওপর গিয়ে পড়ত গাড়িটা। কোনরকমে সামলে নিল সুতপা।

—আমার মনে হয় এরপর বোধহয় তোমাদের ঘরোয়া ফাংশনে আমার যাওয়া অর্থহীন। খবরটা তোমার মাকে তুমিই দিয়ে দিও। আমি এখানেই নামব।

আর একটি কথাও বলল না সুতপা। গাড়ির গতি মন্দীভূত হল। ফুটপাথের পাশে থামতেই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল কাঞ্চন।

জায়গাটা এলিয়াট রোডের জংশন। কসমপলিটন অঞ্চল। ফুটপাথের অপর প্রান্তে রয়েছে একটা বার। ইটালিয়ান বার একটা। সার্কুলার রোডের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে কাঞ্চন থামল। নিজের শরীরকে অসম্ভব ভারী বলে মনে হচ্ছে তার। এত তাড়াতাড়ি ফ্ল্যাটে ফিরলে হয়তো কাজল বিরক্ত হবে। কি হবে তাকে বিরক্ত করে ?

কাঞ্চন বারের সামনে এসে দাঁড়াল।

ওখানে গিয়ে মনের শ্রান্তি দূর করে এলে কেমন হয় ?

না, থাক। হ্যাঁ, যাবে সে। দৃঢ়পায়ে কাঞ্চন বারের মধ্যে গেল।

সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরপুর হয়ে রয়েছে পুরো হলটা। এক একটা টেবিলকে কেন্দ্র করে মেয়ে-পুরুষের ভীড়। সস্তা সেণ্ট আর সোঁদা সোঁদা গন্ধে চারদিক ছেয়ে রয়েছে। ওই সঙ্গে ভ্রমর গুন্‌গুনানির মত মৃদু গুঞ্জন চলেছে।

এই বার অভিজাত শ্রেণীর নয়, ভেতরে পা দিয়েই বুঝতে পারল কাঞ্চন। স্বল্পবাস পরিহিতা যে সমস্ত মেয়েরা ঘোরা-ফেরা করছে, তাদের দৃষ্টি শিকারের ওপরই। শিথিল দেহটাকে তারা টেনে নিয়ে চলেছে আবেশময় চোখের দৃষ্টি সকলের ওপর হেনে হেনে।

ডাইসের ওপর তখন মৃদু বাজনার সঙ্গে তাল রেখে একটি মেয়ে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী সহকারে গাইছে— লাভমি লাভমি হানি

লাভমি আই ডু,

কিসমি কিসমি হানি

কিসমি আই ডু।

কাঞ্চনের মন ঘিন ঘিন করে উঠল। এই পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে ও থাকবে না। দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়েছে মাত্র, কে যেন হাত রাখল ওর পিঠে।

—বাই জোভ, তুমি!

কাঞ্চন ফিরে দেখল, সুশোভন।

—ভাল লাগছিল না। ভাবলাম···

—এসে আবার ফিরে যাচ্ছিলে কেন?

—এখানে বেশিক্ষণ থাকলে আমার দম আটকে আসবে, সুশোভন।

সুশোভন জোরে হেসে উঠল।

—দম এত সহজে আটকাবার বস্তু নয়, ব্রাদার। আমার সঙ্গে এস। ওধারের কেবিনে গিয়ে বসা যাক।

দুজনে কেবিনে গিয়ে বসল।

আজ আর মাত্রা ঠিক রাখতে পারল না কাঞ্চন। প্রথমে অল্প থেকেই আরম্ভ করেছিল। ক্রমে ক্রমে মাত্রা চড়ল—শেষে সুশোভনই ওকে বাধা দিল, আজ কি করছো তুমি?

কাঞ্চনের যে প্রচণ্ড নেশা হয়েছিল তা নয়। জ্ঞান ছিল। শরীর টলছিল শুধু। উত্তেজনা ভেতর থেকে ফেটে বেরুতে চাইছিল। কিন্তু যা ভোলবার জন্যে ও এই নরকে নেমে এসেছে—এতখানি তরল বিষ গলায় ঢেলে দিয়েছে, সে স্মৃতি আগেকার মতই অম্লান রয়েছে।

সুশোভন জোর করে কাঞ্চনকে বারের বাইরে নিয়ে এল।

—চল, তোমায় বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

—এমন কিছু বেতাল অবস্থা আমার নয়। একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলেই হবে।

অবিনাশ ম্যানসনের সামনে ট্যাক্সি থেকে কাঞ্চন যখন নামল তখন ন-টা বেজে গেছে। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। পা দুটো জড়িয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, এই বুঝি পড়ে যাবে। সিঁড়ির কাছে কোনরকমে পৌঁছতেই অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

কাঞ্চনের অবস্থা দেখে তিনি শিউরে উঠলেন।

বললেন, ভায়া তুমি····

—মদ খেয়েছি। আমাকে তিরস্কার করুন অবিনাশদা। শুধু প্রশ্ন করবেন না কেন খেয়েছি ?

—যখনই মোটরে চড়া ওই চোয়াড় মেয়েটার সাথে ঘোরাঘুরি করছো, তখনই জানি সর্বনাশ হতে বিশেষ দেরি নেই। কিন্তু ভাই, যাকে বিয়ে করে আনলে, তাকে কোন্ অপরাধে শাস্তি দিচ্ছো ?

কাঞ্চন ফিকে হেসে বলল, তার অপরাধ নেই। সব অপরাধ আমার—আমার ভাগ্যের, অবিনাশদা।

অবিনাশবাবু কথা বাড়ানো আর বাঞ্ছনীয় মনে করলেন না।

—তুমি এখন সুস্থ নও। ওপরে যাও ভায়া।

কাঞ্চন সিঁড়িব বেলিং চেপে ধরে ওপরে উঠে গেল ধীরে ধীরে। করাঘাত করতেই দরজা খুলে দিল কাজল। তাকে অতিক্রম করে কাঞ্চন নিজের ঘরে চলে গেল। কাঞ্চনের অবিন্যস্ত চুল আর বিপর্যস্ত বেশ-বাস দেখে কাজল উতলা হল।

কি হল—ওকে এমন খাপছাড়া দেখাচ্ছে কেন ?

উত্তর তখনি সে পেল। কাঞ্চন তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র অ্যাল্‌কোহলের গন্ধে তার শরীর গুলিয়ে উঠল। মদের গন্ধের ঘ্রাণ নেওয়ার সুযোগ এর আগে কাজলের হয় নি। তবে স্বাভাবিক বুদ্ধির জোরেই সে বুঝতে পারল, ও মদ খেয়েছে।

মদ খেয়েছে। কেন ? কাজলের মনের আনাচে কানাচে-ব্যাকুল জিজ্ঞাসা উগ্র হয়ে উঠল।

কাঞ্চন নিজের ঘরে গিয়ে হ্যারিংটন চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল।

যদিও ওদের ছাড়াছাড়ি হতে বেশি দেরি নেই, তবু চিন্তা আর ব্যাকুলতার শেষ সীমায় এসে হাঁচোড়-পাঁচোড় করতে লাগল কাজল।

কেন ও মদ খেয়েছে? কেন?

শেষে সঙ্কোচকে জয় করল কাজল। এ ঘরে এসে দ্রুতগলায় প্রশ্ন করল, আপনি ড্রিঙ্ক করেছেন?

কাঞ্চন অ্যাসট্রের ওপর সিগারেটের টুকরোটা রেখে, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ, আমি ড্রিঙ্ক করেছি। কিন্তু তুমি এখানে কেন? একজন মাতালের সামনে আসতে তোমার ভয় করল না?

—আপনি মদ খান! আমি····

—বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে? কাঞ্চনের গলায় তরোয়ালের ধার, বিশ্বাস অবিশ্বাসের আর কি যায়-আসে এখন? এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না।

—কেন আপনি ড্রিঙ্ক করেছেন?

—কেন আমি ড্রিঙ্ক করেছি! কেন ড্রিঙ্ক করেছি জানতে চাও?

কাঞ্চনের গলা দিয়ে এবার যেন একরাশ কাকুতি ঝরে পড়ল, তোমাকে ভোলার জন্যে, ভারাক্রান্ত মনকে আর টেনে নিয়ে বেড়াতে না পারার জন্যে।

বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না কাজলের। কি বলছে ও?

—আমাকে··· আমার জন্যে···

—হ্যাঁ—হ্যাঁ তোমাকে। তোমাকে এখন ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া তো উপায় নেই। মুক্তি চেয়েছো, মুক্তি দেব। কিন্তু তোমাকে প্রাণভরে ভালবাসতে পারব না, এরকম কোন বাধ্যবাধকতা নিশ্চয়ই নেই? নেই বলেই বোধহয় আজ আমার মনের অবস্থা এত শোচনীয়।

কাজল কোনদিন কাঞ্চনকে এভাবে কথা বলতে শোনে নি।

—আজ পর্যন্ত তোমার প্রতিটি কথা আমি মেনে চলবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। নিজের অসুবিধেকে অসুবিধে বলে মনে করি নি। অথচ তুমি ইচ্ছে করে যুক্তিহীন এক জেদকে বজায় রেখে আমার আন্তরিকতাকে মূল্য দাও নি। আমি তোমায় ভালবাসি কাজল। আমাদের বাড়িতে তোমার

পদার্পনের প্রথম মুহূর্ত থেকে।

—আপনি··· পরে বরং···

—মাতালের প্রলাপ বলে মনে হচ্ছে তোমার? না, আমি মাতাল হই নি, আমায় বলতে দাও। তোমাকে কিছু বলার আমার এই শেষ অবকাশ। আমার কাছ থেকে দূরে থাকাই যখন তোমার উদ্দেশ্য ছিল, স্বামী হিসেবে আমাকে মেনে নিতে যখন এতই অসুবিধে, তখন আজ পর্যন্ত কেন আমার পাশে পাশে থেকে আমার মনের দুর্বল স্থানে ইন্ধন জুগিয়েছো? কেন—কেন বলতে পার?

এই শীতেও কাজলের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে।

কি উত্তর দেবে সে— কি বলবে এখন?

—আমি··· আমি তো···

—তুমি খুবই সঙ্কটে পড়ে গেছো দেখছি। আমার কথার উত্তর দিতে হবে না। জোর করে কোন কিছু আদায় করার মধ্যে আন্তরিকতা থাকে না, সে জ্ঞানটুকু এখনও আমার আছে। রাত হয়েছে। শুতে যাও।

মনের মধ্যেটা হু হু করে উঠল কাজলের। কি একটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না। ধীরে ধীরে ফিরে গেল নিজের ঘরে।

রাত বেড়ে চলল। দুজনের মধ্যে একজনেরও খাওয়া হল না। কাঞ্চন নিজের ঘর থেকে এল না খেতে। জানলার ধারে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কাজল। নিজের ওপরই সে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছে। যে আদর্শকে আঁকড়ে থাকার প্রবল ঝোঁক তার ছিল—এখন মনের মধ্যে আর তেমন জোর খুঁজে পাচ্ছে না। কাঞ্চনের স্বার্থত্যাগের জন্যে মন আর্দ্র হয়ে উঠছে।

এক সময় দুটো বাজল।

তিনটে বাজল।

চারটে বাজল ক্রমে। ঘুমন্ত কলকাতা আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে। কালো আকাশ আর কালো নেই। হীরকভোর ছোপ পড়েছে। না ঘুমিয়েই রাত কাটিয়ে দিল কাজল।

ছুটোর পর কাঞ্চন ঘুমিয়ে পড়েছিল। মনের মধ্যে অশান্তভাব বজায় থাকা সত্ত্বেও অ্যাল্‌কোহলের গুণে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঘুম ভাঙল ভোরে। কাজলের কথা মনে পড়তেই নিদারুণ সঙ্কোচে ওর মন নুয়ে পড়ল। কি দরকার ছিল কথাগুলো বলবার? যাক, আর ভেবে লাভ কি? অমিতাভ ন-টার মধ্যে আসবে। হেস্তনেস্তর প্রাথমিক খসড়াটা আজই হয়ে যাবে আশা করা যায়।

বিছানা থেকে নেমে হাত-মুখ ধুয়ে পাশের ঘরে এল। কাজল জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাসি ফুলের মত শুকিয়ে উঠেছে তার সুন্দর মুখ। সমস্ত রাত যে জেগে কাটিয়েছে, দেখলেই তা বুঝতে পারা যায়।

কাঞ্চনের মায়া হল।

ও নম্রগলায় বলল, নেশার ঝোঁকে কাল যদি কোন অবান্তর কথা বলে থাকি, তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

কাজল কিছু বলল না।

—কাল রাত্রে খেয়েছিলে?

—না।

—কেন? আমি কি তোমাকে না খেয়ে থাকতে বলেছিলাম?

—আমি বলি নি সেকথা।

—অত্যন্ত আতান্তরের মধ্যে তোমার সময় কাটছে। আর একটু অপেক্ষা কর। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার সময় তোমার প্রায় এসে গেছে।

কাজল নিজের শ্রান্ত দুচোখ তুলল। তার মাথার রুক্ষ চুলগুলো এলোমেলো। সিঁথির সিঁদুর ম্লান হয়ে হয়ে প্রায় মিলিয়ে এসেছে।

—তোমার কথামত সব ব্যবস্থা করেছি। আমার আইনজ্ঞ বন্ধু অমিতাভ কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে। আইনসঙ্গতভাবে আমাদের সেপারেশনের ব্যবস্থা তাকে দিয়েই করিয়ে নেব।

থর থর করে কাজলের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। সেপারেশন! সে পারবে না, নিজের জেদের খেসারত দিতে আর সে পারবে না। কাঞ্চন কি বুঝতে পারছে না? না, বুঝতে পেরেও অবুঝের মত তার সঙ্গে খেলা করছে?

চোখের জল আর বাধা মানে না। টলটল করতে থাকে কানায় কানায়। কাজল নিজের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে কিছু বলবার জন্যে মুখ তুলল, কিন্তু....

—একি, তুমি কাঁদছো!

দ্রুতপায়ে কাঞ্চন তার কাছে গিয়ে বলল, আমি তো তোমার কথামতই কাজ করেছি!

লজ্জা-সঙ্কোচের পর্দা ছিঁড়ে কাজল বেরিয়ে এল। তীক্ষ্ণ ভেজাগলায় বলল, কেন?' কেন তুমি আমার প্রতিটি কথা এইভাবে মেনে নেবে? কেন তুমি আমার অন্যায় জেদকে দিনের পর দিন প্রশ্রয় দেবে? আমাকে সংযত করার বিন্দুমাত্র অধিকার কি তোমার নেই?

কাঞ্চন নিজের চোখের সামনে যেন নবম আশ্চর্য দেখছে। নিরেট একটা পাষাণে ফাটল ধরেছিল। এখন ভেঙে, গুঁড়িয়ে, দ্রবীভুত হয়ে সম্পূর্ণ গলে যাচ্ছে।

কাঞ্চন আর ইতস্তত না করে সবলে কাছে টেনে নিল কাজলকে। তার নরম দেহ নিজের বুকের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিয়ে ফেলতে চাইল।

আর বাধা মানল না। ফোঁটায় ফোঁটায় অজস্র চোখের জল গড়িয়ে পড়ে কাজলের গাল বেয়ে। এতদিনের রুদ্ধ অভিমান বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত কুল ছাপিয়ে চলল।

সে নিবিড়ভাবে কাঞ্চনের বুকে মুখ ডুবিয়ে দিল।